সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • অক্টো'২০২৪- জানু'২০২৫

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে
আমাদের সব দুঃখ জমা দেবো যৌথ-খামারে,
সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক চাষাবাদে সমান সুখের ভাগ
সকলেই নিয়ে যাবো নিজের সংসারে ॥

-হেলাল হাফিজ
(০৭ অক্টোবর ১৯৪৮ - ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪)

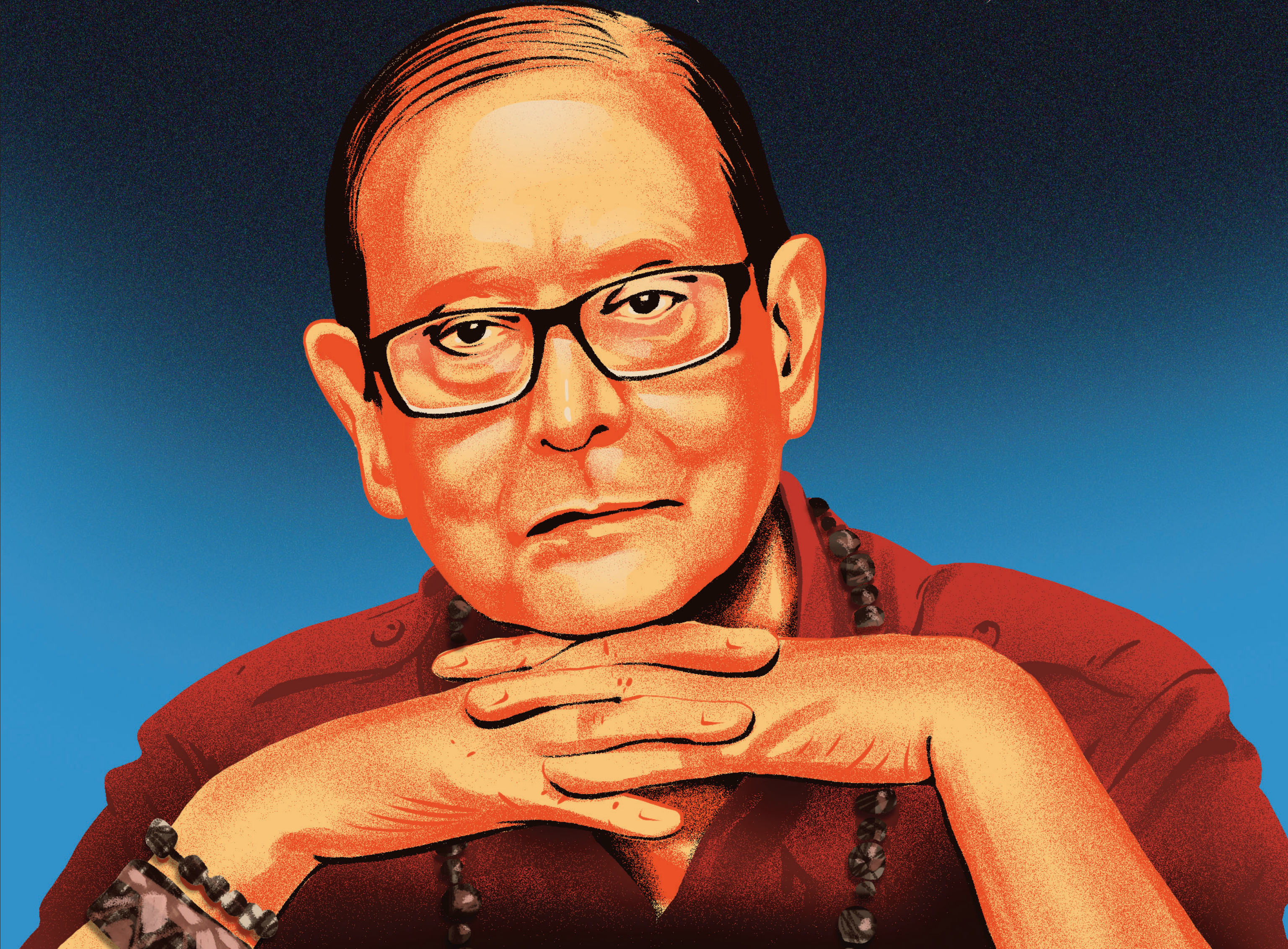

আরেকটি কবিতা লিখুন কবি

অসীম সরকার

কবি হেলাল হাফিজ –
আপনি আজন্ম
পতাকার এবং যথার্থই স্বাধীনতার এবং
যৌবন ও যুদ্ধের কবি।
একদা আপনার কবিতার বীর শব্দেরা পাপড়ি মেলে
ফিনিক্স পাখির মতো
টিএসসি চত্বর থেকে
পল্টন ফার্মগেট কমলাপুর বুড়িগঙ্গা –
সারাদেশ দাপিয়ে বেড়িয়েছে
বোবা বাতাসে।
আপনি কবিতার ছত্রে ছত্রে
ঢেলেছেন দ্রোহের লাল আগুন,
মিছিলে কিংবা আবৃত্তির জনমঞ্চে
হাততালি কুড়িয়েছে আপনার বারুদ শব্দমালা –
কেঁপে উঠেছে মসনদ।
আজ মিছিলের যৌবন যেন
বেওয়ারিশ চিলের
ডানায় ফেরার।
আপনার মিছিলের উন্মাদনা কিংবা
ক্ষুধার কবি রফিক আজাদের
সব ভাত
খেয়ে গেছে
হারামজাদা খোঁড়া তিন শালিক।
কবি রুদ্রের প্রিয় মানচিত্র
আজও খামচে ধরে আছে
পুরানো সেই শকুন।

কবি, আপনি এবং আপনারা সারারাত বৈঠা
মেরেছেন বটে,
ঘাটে শক্ত দড়িতে যে বাঁধা ছিলো নৌকা।
প্লিজ কবি, যৌবন আরও একবার পরুক
যুদ্ধের সাজ।

প্রস্তুত থাক লাঠি-বাঁশি, খাতা-কলম –
রাইফেল রুটি এবং
অতি অবশ্যই মারণাস্ত্র – রণকৌশল।
আরেকটি কবিতা লিখুন কবি –
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
টিএসসি চত্বরে একবিংশ শতাব্দীর
সমবেত লাখো
যৌবনের মাঝে দাঁড়িয়ে
দীপ্তকণ্ঠে পাঠ করুন
আপনার সেই জাগরণের কবিতাখানি।
হোক, আরেকটা যুদ্ধ হোক,
কবিতার শুষ্ক উঠানে ফের যৌবনের বৃষ্টি নামুক।

(২৩.৪.২০২৪)

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

শিক্ষালোক

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন

ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

অক্টোবর ২০২৫ - জানুয়ারি ২০২৫ ● ১১তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

সূচি

বঙ্গদেশে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা
- অক্ষয়কুমার দত্ত ২

জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় কৃষিবীমার নতুন তহবিল চালু
- আবুল কালাম আজাদ ৫

নতুন ফসল আবাদ - প্রতাপ চন্দ্র রায় ও ফজলুল বারি ৯

কবি হেলাল হাফিজের কবিতা ১৬

কবির জন্য ভালোবাসা - সৈকত হাবিব ১৮

শতবর্ষী বিদ্যালয় - তোফাজ্জল হোসেন তারা ১৯

ইটোকেইদের ফিজি - শাঁওলি শহীদ ২০

বায়োগ্যাস স্থাপন ও উদ্যোক্তা তৈরি - শান্ত কুমার দাস ২৩

কবিতা - মুহাম্মদ সামাদ/ শওকত হোসেন/ সিদ্দিক প্রামাণিক ২৫

সফলতার গল্প - কিশোর কুমার ৩০

বই আলোচনা - মাহ্ফুজ সালাম ৩১

প্রধান সম্পাদক
মিফতা নাঈম হুদা

সম্পাদক
ফজলুল বারি

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

প্রচ্ছদ
সামী আজফার

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি irc.com.bd

সম্পাদকীয়

শিক্ষালোকের চলতি সংখ্যাটি এমন এক সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হচ্ছে যখন আমরা হারিয়েছি বাংলা সাহিত্যের এক কিংবদন্তি– তরুণের, যুবকের, প্রেমিকের ও দ্রোহীর কবি হেলাল হাফিজকে। তাঁর ‘এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়’ বাংলাদেশের তরুণ ছাত্রছাত্রীর রক্ত নাচিয়ে তোলার শব্দগুচ্ছ। সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে শিক্ষালোকের বিচরণের জন্যই কেবল নয়, আরেকটি কারণেও তাঁর মৃত্যু আমাদেরকে অনেক বেশি স্পর্শ ও শোকাহত করেছে। কবি হেলাল হাফিজকে আমরা আমাদের একটি সাহিত্যসংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্যোগ নিয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছিলো। কিন্তু ১৩ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যুর সংবাদ আমাদেরকে তাঁর সাহচর্য থেকে বঞ্চিত করে। সে কারণেই চলতি শিক্ষালোকটি পরিণত হলো তাঁকে নিবেদিত সংখ্যায়। হেলাল হাফিজ বাংলা সাহিত্যের এক অমর কবি, আমাদের এ সংখ্যাটি তাঁকে নিয়ে কোনো বিশ্লেষণ নয়, কেবল ক্ষণিকের শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ।

এছাড়া শিক্ষালোকের নিয়মিত আয়োজন সবই থাকছে।

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস
বাড়ী নং- ২২/৯, ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

বঙ্গদেশে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

অক্ষয়কুমার দত্ত

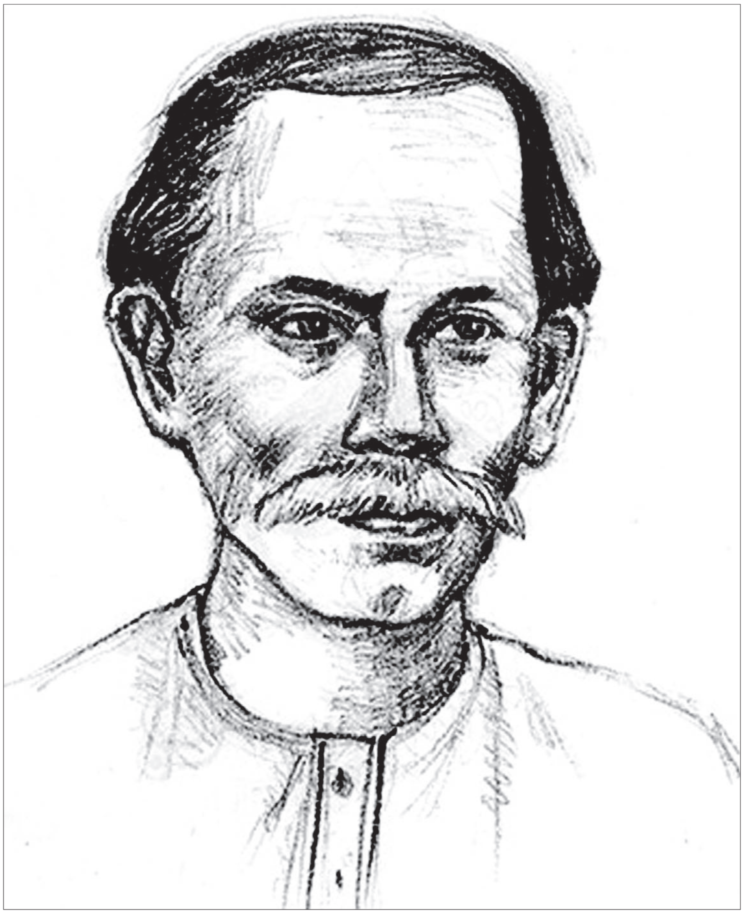

(জন্ম: ১৮২০, মৃত্যু: ১৮৮৬)

শিক্ষা জাতীয় উন্নতির মূল। শিক্ষাপ্রণালী যদি অপকৃষ্ট হয় তবে কোন জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্যের সকলপ্রকার মানসিক বৃত্তির উন্মেষকার্য সম্পাদন। যাহাতে মনুষ্যের শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন হয় শিক্ষাকার্যের তাহাই লক্ষ্য হওয়া কর্তব্য। ইহার কোন বিষয়ে শিক্ষাকার্যের ত্রুটি হইলে জাতীয় উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, অতএব শিক্ষাকার্যের ন্যায় গুরুতর কার্য জগতে আর নাই। রাজ্যের লোকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা রাজার একটি প্রধান কর্তব্য। যে-রাজা এই কর্তব্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী নহেন তিনি ঈশ্বরের নিকট ও লোকসমীপে দোষী হয়েন।

আমাদিগের দেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রচুর মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহাতে যে-সকল ত্রুটি লক্ষ্য হইতেছে তাহা জাতীয় উন্নতির বিশেষ অন্তরায়স্বরূপ গণ্য করিতে হইবে। প্রথমত, কালেজ ও স্কুলে যেরূপ শিক্ষাপ্রণালী ব্যবহৃত হইতেছে তাহা কেবল স্মরণশক্তি উন্নতিসাধনপক্ষে বিশেষ অনুকূল, বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও উন্নতিসাধনের প্রতি তত অনুকূল নহে। শুনিতে পাওয়া যায় যে, প্রধান প্রধান কালেজের অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগকে কোন প্রশ্ন করেন না, কেবল গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়া যান, ছাত্রেরা কেবল নোট লয়। ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তির কিরূপ পরিচালনা হইতে পারে, পাঠকবর্গ তাহা সহজে বুঝিতে পারেন। আমাদিগের কোন বন্ধু একটি কালেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে স্বকীয় বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া গ্রন্থের অর্থ সম্বন্ধে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেন। তাহাতে ছাত্রেরা অসন্তুষ্ট হইয়া, কালেজের অধ্যক্ষের নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ করে। কালেজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'অন্যান্য কালেজে সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষার যেরূপ প্রণালী আছে তাহাই আপনার অনুসরণ করা কর্তব্য। আপনি শিক্ষক নহেন, কেবল ব্যাখ্যাতা মাত্র ও ছাত্রেরা ছাত্র নহে, কেবল শ্রোতা মাত্র।'

ইংরাজি কালেজ ও স্কুলে যেরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহাতে যে-ছাত্রের যে-বিষয়ে স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে সে-বিষয়ে তাহার স্বাভাবিক ক্ষমতা স্ফূর্তি পায় না। এক্ষণে প্রবেশিকা ও অন্যান্য পরীক্ষার এইরূপ নিয়ম যে, প্রত্যেক বিষয়ে পারদর্শিতার চিহ্নস্বরূপ একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক পাইতে হইবে, কোন বিষয়ে সেই অঙ্কের ন্যূন হইলে অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতা থাকিলেও তাঁহাকে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য করা হয় না। পূর্বে হিন্দুকালেজে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, সকল বিষয়ে উল্লিখিত অঙ্কের সমষ্টি ধরিয়া ছাত্রের পারদর্শিতা নিরূপিত হইবে, তাহাতে কোন ছাত্রের পাঠ্য কোন বিষয়ে স্বাভাবিক অক্ষমতা থাকিলেও তাহার অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতা দ্বারা তাহা সম্পূরিত হইত, কিন্তু এক্ষণে সেরূপ হয় না। এমনসকল ছাত্র দৃষ্ট হয় যাহাদিগের সাহিত্য বিষয়ে স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে, কিন্তু গণিত বিষয়ে সেরূপ স্বাভাবিক বুদ্ধি দৃষ্ট হয় না। তাহারা বহু আয়াস ও বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও শেষোক্ত বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে সক্ষম হয় না। তাহারা গণিত বিষয়ে নির্দিষ্ট অঙ্ক প্রাপ্ত না হইলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং তাহারা ভগ্নোদ্যম হয়, এবং সেই ভগ্নোদ্যম নিবন্ধন তাহাদিগের ভাবী উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। যে-ব্যক্তি প্রসিদ্ধ সাহিত্যবিৎ পণ্ডিত অথবা সুলেখক হইয়া জগতে খ্যাতিলাভ করিতে সক্ষম হইত, সে বিশীর্ণ পুষ্পের ন্যায় হতশ্রী ও ম্লান হইয়া জগতে আপনার সৌরভ বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না।

এতদ্দেশে কালেজ ও স্কুলে ছাত্রদিগের শারীরিক উন্নতিসাধনের প্রতি তত মনোযোগ প্রদত্ত হয় না। শুনিতে পাওয়া যায়, ইংলণ্ডের বিদ্যালয়সকলে ব্যায়াম ও পুরুষত্বসাধক ক্রীড়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহাতে যে ইংরাজেরা দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ হইয়া সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে ইহার আশ্চর্য কি? ইংরাজেরা আপনাদিগের দেশে উভয় শারীরিক ও মানসিক উন্নতিসাধক শিক্ষার প্রতি সমান মনোযোগ প্রদান করিয়া

> আজিকার দিনে ইংরাজিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে কোনমতেই চলে না এবং ইংরাজদিগের নিকট হইতে আমাদিগকে এখনও অনেক শিক্ষা করিতে হইবে, তথাপি ইহা প্রকৃত জাতীয় উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধকস্বরূপ বলিতে হইবে। স্বকীয় ভাষায় অনুশীলন হইয়া স্বভাবতঃ যে জাতীয় উন্নতির অভ্যুদয় হয় তাহাই প্রকৃত জাতীয় উন্নতি

থাকেন, কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকের সম্বন্ধে সেরূপ করেন না। কেনই বা করিবেন? ইহা তো তাঁহাদিগের স্বদেশ নহে। ছাত্রেরা দিবারাত্রি কেবল পুস্তক অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকে। আপনাদিগের শারীরিক উন্নতিসাধনের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান করেন না, সুতরাং তাহারা শীঘ্র ক্ষীণ রুগ্ন ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। অনেক নব যুবকরা চক্ষুর পীড়া ও শিরোভ্রমণ-রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে দৃষ্ট হয়। যদি শারীরিক ক্ষীণতা ও রুগ্নতাবশত তাহারা অকর্মণ্য হইয়া পড়িল, তবে কেবল গ্রন্থ পাঠ করিয়া কি লাভ হইল? স্বাস্থ্যই সকল উন্নতি ও সকল ধর্মসাধনের মূল।

জাতীয় ভাবের অভাব বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর আর এক দোষ। আমাদিগের যদি স্বদেশীয় রাজা থাকিত তাহা হইলে তাঁহার সংস্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য ভাষা অধীত হইত বটে, কিন্তু প্রধানরূপে সংস্কৃত ও বাঙ্গলার প্রতি মনোযোগ প্রদত্ত হইত, সন্দেহ নাই। এক্ষণে যেমন ইংরাজিতে উচ্চ উচ্চ উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে তখন সংস্কৃত ও বাঙ্গলাতে উচ্চ উচ্চ উপাধি প্রদত্ত হইত, এরূপ হওয়াই এদেশের পক্ষে ন্যায্য। কিন্তু রাজা বিদেশীয়, তন্নিবন্ধন সেরূপ হইতেছে না ও অন্যদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাহা হওয়াও উচিত নহে। আজিকার দিনে ইংরাজিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে কোনমতেই চলে না এবং ইংরাজদিগের নিকট হইতে আমাদিগকে এখনও অনেক শিক্ষা করিতে হইবে, তথাপি ইহা প্রকৃত জাতীয় উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধকস্বরূপ বলিতে হইবে। স্বকীয় ভাষায় অনুশীলন হইয়া স্বভাবতঃ যে জাতীয় উন্নতির অভ্যুদয় হয় তাহাই প্রকৃত জাতীয় উন্নতি। এ-প্রকার স্বভাবসিদ্ধ জাতীয় উন্নতিসাধনের সময় আমরা জাতীয় ভাষার সাহায্য লইলেও উন্নতির জাতীয় ভাব বিলোপিত হইত না। অন্যান্য ভাষা হইতে আমরা যে সাহায্য লইতাম তাহা আমাদিগের জাতীয় ভাষার শরীরে পরিণত হইয়া আমাদিগের উন্নতিকে কখনও বিজাতীয় প্রকৃতি প্রদান করিতে সমর্থ হইত না। এক্ষণে যেমন আমাদিগের মনের সকল ভাব ইংরাজি ছাঁচে বিগঠিত হইতেছে, এমনকি, আমরা ইংরাজিতেও চিন্তা করিয়া থাকি, সে-প্রকার না হইয়া আমাদিগের স্বাভাবিক বৃত্তিসকল স্বাধীনরূপে স্ফূর্ত হইত এবং এইরূপ স্ফূর্ত হইয়া যে-জাতীয় উন্নতির অভ্যুদয় হইত তাহাই প্রকৃত জাতীয় উন্নতি। আমাদিগের কালেজ ও স্কুলে যে-সমস্ত পুস্তক পঠিত হইয়া থাকে তাহাতে জাতীয় ভাবের অভাব বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়।...

অর্থকরী ও লোকোপকারী বিদ্যাশিক্ষার অভাব বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর আর একটি দোষ। এক্ষণে উকিল ও ডাক্তার ব্যবসায়ী লোকের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ঐসকল ব্যবসায়ে নূতন প্রবৃত্ত লোকের অন্ন হওয়া সুকঠিন, এক্ষণে অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বন না করিলে আর উপায় নাই। এক্ষণে সন্তানেরা ভবিষ্যতে কি প্রকারে উপজীবিকা আহরণ করিবে এ-বিষয়ে বয়স্ক লোকের বিলক্ষণ উদ্বেগ ও আশঙ্কা জন্মিতেছে। গবর্ণমেন্ট যদি স্থানে স্থানে শিল্প ও শ্রমিক বিদ্যালয়সকল সংস্থাপন করেন তাহা হইলে দেশের মহোপকার সাধন হয়। আমাদিগের বর্তমান লেফটেনেন্ট গবর্ণর মহোদয় উল্লিখিত বিদ্যালয়সকল সংস্থাপনের কিঞ্চিত যত্ন প্রকাশ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু এ-বিষয়ে কেবল গবর্ণমেন্ট মনোযোগী হইলে হইবে না। আমাদিগের দেশের ধনাঢ্য লোকদিগেরও বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত যে, তাঁহারা ঈশ্বরের কোষাধ্যক্ষ, সংসারের উপকারার্থেই ঈশ্বর তাঁহাদিগকে ধনশালী করিয়াছেন।

যখন বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা দেশীয় যুবকদিগের শারীরিক উন্নতিসাধন হইতেছে না, যখন তদ্দ্বারা তাহাদিগের কেবল স্মরণশক্তিরই উন্নতি সাধন হইতেছে, যখন ঐ প্রণালীনিবন্ধন যে-ছাত্রের যে-বিষয়ে যে-স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, তাহা স্ফূর্তি পাইতেছে না, যখন অর্থকরী ও লোকোপকারী বিদ্যার শিক্ষা-বিরহে লোকের ভবিষ্যতে অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তখন শিক্ষা-সম্বন্ধে দেশের অবস্থা অবশ্য অতি শোচনীয় বলিতে হইবে। এই শোচনীয় অবস্থা নিরাকরণের প্রতি গবর্ণমেন্টের বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। এদেশের প্রতি তত মমতা না-থাকা প্রযুক্ত উল্লিখিত বিষয় সকলের মধ্যে যে যে বিষয়ে গবর্ণমেন্টর তত মনোযোগ পরিলক্ষিত হইবে না, সেই সেই বিষয়ে আমাদিগের নিজের মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। সমবেত চেষ্টা দ্বারা কি না হইতে পারে? শিক্ষা সম্বন্ধে একটি অভাব আছে তাহার দূরীকরণার্থ গবর্ণমেন্ট যত্নবান হইবেন এমত আমরা কখন প্রত্যাশা করিতে পারি না, সে-অভাব শিক্ষাপ্রণালীতে জাতীয় ভাবের অভাব। এই অভাব মোচনার্থ আমাদেরই যত্নবান হইতে হইবে। যদ্যপি আমাদিগের দেশের ধনাঢ্য ও অন্যান্য লোক একত্রিত হইয়া একটি জাতীয় শিক্ষাসমাজ স্থাপন করেন এবং সেই জাতীয় শিক্ষাসমাজে যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাতে শিক্ষার উচ্চতম বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করিবেন তাঁহাদিগকে এবং যে-সকল ব্যাক্তি ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইবার পর সেই সকল গ্রন্থে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদিগকে লোভনীয় অর্থ পারিতোষিক ও উপাধি প্রদান করেন তাহা হইলে দেশের কতদূর রক্ষিত হয় তাহা বলা যায় না। যখন আমাদিগের দেশের লোকে যাঁহারা উল্লিখিত শিক্ষাসমাজ হইতে উপাধি প্রাপ্ত না হইবেন, তাঁহাদিগকে প্রকৃত বিদ্বান বলিয়া গণ্য করিবেন না, তখন বঙ্গসমাজে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে এমত বলা যাইতে পারিবে।

(সংক্ষেপিত)

জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় কৃষিবীমার নতুন তহবিল চালু

আবুল কালাম আজাদ

বাংলাদেশের কৃষি অনেকাংশ প্রকৃতি নির্ভর। ভূপ্রকৃতিগত কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রায় প্রতি বছর দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে। যার প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষি এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কৃষক জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশে কৃষিতে বর্তমানে যে ঝুঁকিগুলো তাৎপর্যপূর্ণ তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শস্যহানি অন্যতম। প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগের কারণে একদিকে যেমন কৃষির উৎপাদন ব্যাহত হয় অন্যদিকে কৃষকদের আর্থিক ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। আশির দশকে দেশে প্রথম শস্যবীমার উদ্যোগ নেয়া হলেও সেটি নানান কারণে কৃষকদের মাঝে আগ্রহ তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। শুরুতে যে ধরনের ভর্তুকি বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন ছিল বাস্তবায়নকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন তা নিশ্চিত করতে পারেনি। সরকারি নির্দেশনা মেনে কয়েক দফা উদ্যোগ নিলেও তা সফল হয়নি। তবে বিগত সময়ে সফল না হলেও শস্য বীমা চালুর যৌক্তিকতা কমেনি বরং সাম্প্রতিক সময়ে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, কৃষি কাজ প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন খরা, অতি বৃষ্টি, বন্যা, অনিশ্চিত আবহাওয়া পরিবর্তন, টর্নেডো এবং নানান রোগ-বালাই প্রভৃতির প্রতি আগের চেয়ে বেশি সংবেদনশীল। প্রায়শ নানা কারণে কৃষক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের পূর্বাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক বন্যা দেখা দেয়। ফলে প্রচুর ফসলহানি ঘটে। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি আগের চেয়ে আরও বেড়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বাজার ঝুঁকি। খুব দুঃখের যে, বাংলাদেশ প্রধানত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দেশ হলেও কৃষির উন্নয়ন এবং ঝুঁকি মোকাবিলায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ প্রতীয়মান হয় না।

এটি শুধু কৃষকেরই ক্ষতি নয়, গোটা দেশের ক্ষতি। ফসলের ক্ষতিতে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় যা দেশের সবাইকে প্রভাবিত করে। কৃষকের এ ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব যদি দেশের সব কৃষককে তার ফসলের বীমার আওতায় আনা যায়। এগুলো বিবেচনায় নিয়ে শস্য বীমা চালু এবং বাস্তবায়ন করলে কৃষকদের মনোবল দৃঢ় থাকবে এবং আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে তারা রক্ষা পাবে। কৃষি বা শস্য বীমা হচ্ছে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হাতিয়ার যা কৃষককে তার ফসলের উৎপাদন ক্ষতির বিপরীতে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। কৃষিবীমার অধীনে কৃষককে অল্প কিছু অর্থ প্রিমিয়াম হিসেবে কোনো বীমা কোম্পানিকে দিতে হয় যাতে কোনো ঝুঁকি যেমন বন্যা, খরা, রোগ-বালাই থেকে একটি আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এ কাভারেজ সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাধারণত একটি শস্য মৌসুম কিংবা বছরের জন্য হয়ে থাকে যেখানে কৃষক ক্ষতির মুখোমুখি হলে কোম্পানি তা পুষিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করে, যাতে ক্ষতির ঘটনা ঘটার পূর্বে কৃষক যে

আর্থিক অবস্থায় ছিল, ফসলের ক্ষতি হলেও কৃষক সেই অবস্থাতেই ফিরতে পারে।

কৃষকেরা অনেকে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে কিংবা ধারে কৃষি উপকরণ কিনে চাষাবাদ করেন। যখন কৃষক ক্ষতির সম্মুখীন হন, তখন ধার করা অর্থ পরিশোধের সামর্থ্য হ্রাস পায় যা পরবর্তীতে কৃষিতে বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করে। সেক্ষেত্রে কৃষিবীমা এ ঝুঁকির হাত থেকে কৃষককে নিরাপত্তা দিতে পারে এবং কৃষি কর্মকাণ্ডকে অটুট রাখতে সহায়তা করে। অন্যদিকে, কৃষিবীমা চালু হলে কৃষকরা বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে সহজে ঋণ পেতে সক্ষম হবে। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বছরের পর বছর ধরে কৃষি কাজকে খুব ঝুঁকিপূর্ণ বলে অভিহিত করে ঋণ দানে বিরত থাকে। বীমা থাকলে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো আর সেটি মনে করবে না এবং কৃষিতে ঋণের প্রবাহ বাড়লে কৃষি উৎপাদন বাড়বে, কৃষকের জীবন যাত্রার মান বাড়বে। যে সব দেশে কৃষিবীমা চালু হয়েছে সেখানে দেখা যায় এই প্রকল্প থেকে কৃষকেরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন। বীমা থাকায় ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের কৃষি আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছেন। তাদের কৃষি উদ্যোগ এবং প্রকল্পগুলো প্রসারিত করতে পারেন। যার ফলে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে। ফলে কৃষকদের কৃষি প্রচেষ্টাকে অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি থেকে রক্ষা করার জন্য কৃষি বীমা ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি হয়ে উঠেছে। তবে এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন। সরকারি উদ্যোগে এবং খরচে কৃষিবীমা স্কিম চালু করার মধ্য দিয়ে সরকার শুরুটা করতে পারে, যেখানে কৃষকদের জন্য ভর্তুকিযুক্ত বীমার সুযোগ প্রদান করবে। যার অধীনে কৃষক বিভিন্ন শস্য, হাঁস-মুরগি, পশু ও মৎস্য সম্পদসহ বিভিন্ন ঝুঁকিগুলো কাভার করতে সক্ষম হবে। এটি সত্য যে, বাংলাদেশের কৃষিখাত অর্থনীতির ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করে, জনসংখ্যার একটি বড় অংশের ভরণ-পোষণ প্রদান করে এবং রপ্তানি আয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে। দেশের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশের খাদ্য চাহিদা যাদের ওপর নির্ভর করে এবং আমাদের রপ্তানি আয়ে প্রচুর অবদান রাখে যারা এমন কৃষকদের উচ্চ উৎপাদন ঝুঁকির বিরুদ্ধে সুরক্ষার মাধ্যমে এই খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে শস্য বীমা উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ঝুঁকি প্রশমন কৌশলের মাধ্যমে সরকার কৃষি খাতের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে, কৃষি শিল্পে বর্ধিত বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে পারে। এ ধরনের কৃষিবীমার প্রভাব কৃষকদের ঝুঁকি কমানোর বাইরেও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। এটি কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি এবং স্থায়িত্বকে উন্নীত করবে। কৃষিবীমাতে সরকার বিনিয়োগ করে ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করতে পারে যেখানে দেশের প্রতিটি কৃষকের নিকট প্রয়োজনীয় এই আর্থিক নিরাপত্তার সুযোগ থাকবে। বীমা প্রকল্পের অব্যবহৃত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে, ভর্তুকি সহায়তা বাড়ানোর মাধ্যমে এবং কৃষকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে, কৃষি খাত এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবনে উল্লেখযোগ্য সুবিধা এবং পরিবর্তনমূলক প্রভাব নিশ্চিত করতে পারে। বীমা স্কিম একটি স্থিতিস্থাপক এবং সমৃদ্ধশালী কৃষি শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে পারে যা কৃষক এবং দেশ উভয়েরই উপকার করে। ঝুঁকি প্রশমন কৌশলের মাধ্যমে সরকার কৃষি খাতকে গুরুত্ব দিয়ে কৃষি শিল্পে বর্ধিত বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে পারে। এ ধরনের কৃষিবীমার প্রভাব কৃষকদের ঝুঁকি কমানোর বাইরেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে।

সরকার দেশে বিদেশি মুদ্রার সরবরাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রবাসী শ্রমিকদের আয় দেশে পাঠালে তার ওপর নগদ প্রণোদনা প্রদানের যে উদ্যোগ নিয়েছে, তেমনি দেশের অভ্যন্তরে কৃষকেরা যারা কৃষি পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে অবদান রাখছে এবং বিদেশ থেকে খাদ্য সামগ্রী আমদানির ওপর চাপ কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করছে তাদের কৃষি কাজ ঝুঁকিমুক্ত করতে আর্থিক প্রণোদনার অংশ হিসেবে বিনামূল্যে কৃষি বীমার সুযোগ করে দেওয়া সরকারের কর্তব্য। একইভাবে, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তার জন্য সরকার সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করেছে, তেমনি প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র চাষীদের বর্তমান আর্থিক নিরাপত্তার স্বার্থে সর্বজনীন কৃষিবীমা চালু করা অত্যন্ত জরুরি এবং তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষিকে ঝুঁকিমুক্ত করতে সরকারের এ ধরনের পদক্ষেপ ভীষণ প্রয়োজন। সরকারি বীমা ব্যবস্থার প্রচলন হতে পারে দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সরকারি স্বীকৃতির প্রতীক স্বরূপ। সময় এসেছে কৃষিবীমার মূল্যকে স্বীকৃতি এবং একে দেশের সব কৃষকের কাছে সহজলভ্য করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়ার। ভবিষ্যতে নিরাপদ ও সমৃদ্ধ জীবিকার জন্য প্রচেষ্টারত প্রতিটি কৃষকের জন্য কৃষিবীমা কোনো বিলাসিতা নয় বরং অতি প্রয়োজনীয় একটি আর্থিক নিরাপত্তার হাতিয়ার।

কৃষিবীমার নতুন তহবিল: বিগত ১১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে 'ইম্পেটাস ফর ইনোভেশন: ইন্ট্রোডিউসিং উদয় অ্যান্ড অভয়' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশের কৃষি খাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দু'টি নতুন কৃষিবীমা তহবিল চালু করেছে বাংলাদেশ মাইক্রোইন্স্যুরেন্স মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (বিএমএমডিপি)। প্রান্তিক কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহনশীলতা বাড়াতে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্যোগের আওতায় চালু হওয়া দুটি তহবিলের মধ্যে একটি হলো 'ক্লাইমেট মাইক্রোইন্স্যুরেন্স ইনোভেশন ফান্ড'-'উদয়', যা জলবায়ু সচেতন মাইক্রোইন্স্যুরেন্স পণ্য উদ্ভাবনের জন্য আর্থিক সহায়তা দেবে। অন্যটি হলো 'ক্লাইমেট রিস্ক রেজিলিয়েন্স ফান্ড'-'অভয়', যা পুনঃবীমাকারীদের সক্ষমতা বাড়াতে

সহায়ক হবে। বাংলাদেশে সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের অর্থায়নে প্রকল্প দু'টি বাস্তবায়ন করবে সুইস কন্ট্যাক্ট বাংলাদেশ। তহবিল দুটি কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জলবায়ু ঝুঁকির সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার সক্ষমতা বাড়াতে ভূমিকা রাখবে। এতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন এবং কৃষি খাতের উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত হবে। তহবিলের জন্য আবেদন শুরু হবে ১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ থেকে। আবেদনের প্রক্রিয়া সহজ করতে তথ্য অধিবেশনের আয়োজন থাকবে। এতে নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনা এবং সম্ভাব্য সামাজিক অংশীদারদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় কৃষি খাতে ক্ষুদ্রবীমার গুরুত্ব অনেক। মোবাইল ফোন ও স্যাটেলাইট ডেটার মতো তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করে কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাশ্রয়ী বীমা পণ্য সরবরাহ করা যেতে পারে। আলোচনায় কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ক্ষুদ্রবীমার গুরুত্ব এবং এটি সহজলভ্য করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কৃষকদের মধ্যে দূরত্ব কমানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়া হয়। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জলবায়ু-সহনশীল বীমা মডেল তৈরির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উদ্যোগটি জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশের কৃষি খাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। দীর্ঘ কর্তৃত্ববাদী শাসনামলে কৃষিও নানাভাবে অবহেলা এবং বঞ্চনার শিকার হয়েছে। দেশে একটি নতুন জাগরণ ও নতুন দিনের সূচনা হয়েছে। বিভিন্ন খাতে অন্তর্বর্তী সরকার নানা ধরনের জনবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। ব্যাপক জনগোষ্ঠী এবং মৌলিক এ অর্থনৈতিক খাতটি বর্তমান সরকারের নানামুখী উদ্যোগে ঘুরে দাঁড়াবে এ প্রত্যাশা সবার। প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি অনাবৃত রেখে কৃষি খাতে বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি মজবুত করতে কৃষির অবদান অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং যুগোপযোগী দিক নির্দেশনায় একটি স্থায়ী এবং টেকসই শস্য বীমা ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন কৃষিতে দুর্দিন দূর করে সুদিন ফেরাতে অবদান রাখবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি মোকাবেলায় বিনামূল্যে কিংবা ভর্তুকিযুক্ত কৃষি তথা শস্য খাতে নতুনভাবে চালু হওয়া উল্লিখিত বীমা কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে কার্যকর করা এখন সময়ের দাবি। মনে রাখা প্রয়োজন আজকের ঝুঁকিমুক্ত কৃষি, আগামীর সুরক্ষিত বাংলাদেশ।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ডিজিটাল কমিউনিকেশন চ্যানেল ও এগ্রিকালচারাল সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম: কৃষি উৎপাদন বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষিখাতের অবদান প্রায় ১৪%। পাশাপাশি, শ্রমশক্তির ৪১% মানুষের জীবিকা এ খাতের ওপর নির্ভরশীল। কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ তৈরি পোশাক খাত ও প্রবাসী আয়ের ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। পরিণতিতে দেশে খাদ্যদ্রব্য আমদানির প্রবণতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা কমিয়ে আনতে কার্যকরী খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খল ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে সময়োপযোগী কৌশল গ্রহণ করে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে শক্তিশালী যোগাযোগ চ্যানেল স্থাপন করা দরকার। সঠিক যোগাযোগ চ্যানেলের অভাবে খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে পারে। খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খল একটি বিস্তৃত ও জটিল নেটওয়ার্ক, যেখানে গ্রামীণ কৃষক, জেলে, খামারি ও মধ্যস্বত্বভোগী এবং শহুরে খুচরা বিক্রেতারা পরস্পর নির্ভরশীল উপায়ে কাজ করার মাধ্যমে গ্রাম থেকে তাজা শস্য ও মাছ-মাংস শহরের বাজারে নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে, সবগুলো পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থাকা সত্ত্বেও যোগাযোগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দূরত্ব রয়েছে, যা দক্ষ সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। অদক্ষ সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রান্তিক কৃষকেরা কম মুনাফা পাচ্ছে এবং খাদ্যপণ্যের অপচয়ও ঘটছে। এজন্য মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি ও ব্যবহার এবং এগ্রিকালচারাল সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম শক্তিশালী করার দিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

ডিজিটাল কমিউনিকেশন চ্যানেল: সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যের আদান-প্রদান নিশ্চিত করার মাধ্যমে শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা ইতিবাচকভাবে পুরো সরবরাহ শৃঙ্খলের গতিপ্রকৃতি বদলে দিতে পারে, যা একই সঙ্গে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনার সকল অংশীজনদের মুনাফা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখবে। কার্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থা অংশীদারদের মধ্যে কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখবে। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগে কার্যকরী চ্যানেলের মাধ্যমে কৃষক, জেলে, মধ্যস্বত্বভোগী এবং খুচরা বিক্রেতারা বাজারের চাহিদা, লজিস্টিক চ্যালেঞ্জ এবং আবহাওয়ার সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিতে সক্ষম হবেন। জনপ্রিয় ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম ইমোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেখানে রয়েছে হাই-কোয়ালিটি ভিডিও কলের সুবিধা। বর্তমানের ইন্টারনেটের যুগে এ ধরনের ডিজিটাল চ্যানেলে সহজেই যোগাযোগ করা যায়। পচনশীল পণ্য ব্যবস্থাপনায় পরিবহন, রিয়েল-টাইমে বাজারমূল্য এবং চাহিদা সম্পর্কে সঠিক ও সময়োপযোগী তথ্যের আদান-প্রদান অত্যন্ত জরুরী। উদাহরণ স্বরূপ: যদি কোনো কৃষক সময়মতো জানতে পারেন যে নির্দিষ্ট একটি খাদ্যপণ্যের চাহিদা বাড়ছে, তবে তিনি তার উৎপাদিত প্যণের মূল্য নির্ধারণে এবং সেই পণ্য সরবরাহে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে পারবেন। ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে কৃষক, জেলে, ও খামারিরা সহজেই মধ্যস্বত্বভোগী বা খুচরা বিক্রেতাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন। যা পুরো সরবরাহ শৃঙ্খলের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে। ইতিমধ্যেই কিছু প্রতিষ্ঠান আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষকদের বাজারমূল্য, আবহাওয়ার

পূর্বাভাস এবং ফসল ব্যবস্থাপনার বিষয়ে রিয়েলটাইম তথ্য দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) প্রতিবেদন অনুযায়ী, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকেরা তাদের ফসলের উৎপাদন ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। একইভাবে, ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে কৃষক, জেলে, খামারি, মধ্যস্বত্বভোগী ও খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে সময়মতো যোগাযোগ নিশ্চিত করে খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব। হাই-কোয়ালিটি ভিডিও কল ও ছবি আদান-প্রদানের মাধ্যমে স্বচ্ছতা যেমন নিশ্চিত করা যাবে, তেমনি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক আস্থাও বৃদ্ধি পাবে; পাশাপাশি গ্রামীণ কৃষক, জেলে ও খামারিদের যোগাযোগ খরচও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। দেশের কার্যকরী খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খল সার্বিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। গ্রামীণ পর্যায়ে কৃষক, খামারি ও জেলেরা এবং শহরের খুচরা বিক্রেতারা দেশের খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের মধ্যে রিয়েল-টাইম এবং স্বচ্ছ যোগাযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে খাদ্য অপচয় যেমন হ্রাস করা যাবে, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাস করে মুনাফা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখা সম্ভব। ডিজিটাল যোগাযোগ এক্ষেত্রে অংশীদারদের মধ্যে কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশজুড়ে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা বাড়াতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

এগ্রিকালচারাল সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম: বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে এগ্রিকালচারাল সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহজ নীতিমালা তৈরি এবং তা কার্যকর করার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে ক্রস-সেক্টরাল কোঅর্ডিনেশন এবং কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক ব্যবহারের ওপর বৈশ্বিকভাবে গুরুত্ব দেওয়ার জোর দাবী উঠেছে। এজন্য একটি টেকসই লজিস্টিক সলিউশন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। ব্লকচেইনের মতো সর্বাধুনিক ফোরআইআর প্রযুক্তি ব্যবহার করে উদ্ভাবিত ডিজিটাল প্রযুক্তিগত সমাধানগুলোর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আরও বৃহৎ পরিসরের জন্য টেকসই এগ্রিকালচার সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে রূপান্তর করা অত্যাবশ্যক। বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে এগ্রিকালচারাল সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে তৈরি একটি টেকসই এগ্রিকালচারাল ইকোসিস্টেম খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এবং এর সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতের জন্য আরও অনেক সুবিধা বয়ে আনার সুযোগ রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ক্রাউডসোর্সিং, স্যাটেলাইট ডাটা এবং এগ্রিকালচারাল সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টসহ বিভিন্ন ডিজিটাল ডাটা সিস্টেম ব্যবহার করে একটি সার্বজনীন ফুড ডাটা সিস্টেম উন্নয়নের ওপর সরকারের নিশ্চিতভাবে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। জাতিসংঘের হাই-লেভেল পলিটিক্যাল ফোরাম অন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের (HLFP) উদ্যোগে সম্প্রতি 'ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেসন অব এগ্রিকালচারাল সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট টু এনশিউর ফুড সিকিউরিটি ইন দ্য নিউ নরমাল' শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় উল্লিখিত বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। গ্রামীণ এবং প্রান্তিক পর্যায়ে ছড়িয়ে থাকা কৃষিতে জড়িত সংস্থাগুলোকে বিশ্ব বাজারের সাথে যুক্ত করার জন্য একটি শক্তিশালী সাপ্লাই চেইন গঠন করা প্রয়োজন। গত এক দশকে কৃষি গবেষণা, ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং, চাষাবাদ, প্রতিকূল জলবায়ু মোকাবেলা এবং কৃষি খাতের টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ডিজিটাল পদ্ধতির ওপর ভর করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে আরো ত্বরান্বিত করার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। মহামারি পরবর্তী সময়ে কৃষক, কৃষিপণ্যের ক্রেতা, সরবরাহকারী এবং সমগ্র সাপ্লাই চেইনের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার এসব নতুন ধারণা ও সেবাকে টেকসই করার লক্ষ্যে কাজ করার সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে।

শেষ কথা: কৃষি বীমাসহ বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অন্যান্য দেশের সাথে প্রযুক্তি, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতাগুলো শেয়ার করে নতুন কৌশল ও প্রযুক্তিগুলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হবে। এগ্রিকালচারাল সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট-এর সাথে জড়িত বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সহযোগিতামূলক উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগের টেকসই প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে এগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার এবং বৃহত্তর সুবিধার জন্য বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে দীর্ঘমেয়াদি কর্মকৌশল এবং তার বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি মাত্র। এজন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও এজেন্সি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা এবং বিপণন প্রতিষ্ঠানসহ সকলের সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসা দরকার। এছাড়াও বাংলাদেশসহ বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে এগ্রিকালচারাল সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট শক্তিশালী করতে একটি সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের ওপর সরকারের সুদৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

লেখক: সহকারী মহাব্যবস্থাপক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট)
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

নতুন ফসল আবাদ

সিদীপের দুই জন কৃষকের একটি করে প্লটে দুই বছরে বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ পদ্ধতি, উৎপাদন ও আয়-ব্যয়'

প্রতাপ চন্দ্র রায় ও ফজলুল বারি

আলোচ্য নিবন্ধে দুই জন কৃষকের একটি করে প্লটে গত ২০২২ সালের মধ্য-এপ্রিল থেকে ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত যে সকল ফসলের চাষ তারা করেছেন তাদের চাষ পদ্ধতি এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে এই নিবন্ধটি লেখার একটি পটভূমি তুলে ধরতে চাই।

আলোচ্য নিবন্ধে দুই জন কৃষকের একটি করে প্লটে গত ২০২২ সালের মধ্য-এপ্রিল থেকে ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত যে সকল ফসলের চাষ তারা করেছেন সে সকল ফসলের চাষ পদ্ধতি এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু এর আগে এই নিবন্ধটি লেখার একটি পটভূমি তুলে ধরতে চাই।

২০২২ সালের প্রথমদিকে আমরা কৃষক পর্যায়ে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চাষ পদ্ধতি ও আয়-ব্যয় নিয়ে একটি “কেইস স্টাডি” করার চিন্তা-ভাবনা করি। কারণটা ছিল বিবিধ। বাংলাদেশে বর্তমানে বেশ কিছু নতুন নতুন ফসলের আবাদ হচ্ছে। অতি সম্প্রতি ব্রকলি চাষ নিয়ে আমরা শিক্ষালোকে একটি নিবন্ধ ছাপিয়েছি। এরই ধারাবাহিকতায় গ্রীষ্মকালীন টমেটো সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করি। বিশেষ করে এই জন্য যে গ্রীষ্মকালে টমেটোর চাষ আমাদের দেশে সাম্প্রতিক, যদিও বাজারে গ্রীষ্মকালে টমেটো পাওয়া যায় অনেকদিন ধরেই। সেটা হচ্ছে সবই ভারত থেকে আমদানিকৃত। আমাদের দেশে কেবল শীতকালেই টমেটোর চাষ হত, গরম কালে নয়। কেননা আমাদের দেশে যে জাতগুলি চাষ করা হয় তা' গ্রীষ্মকালে চাষ করার উপযোগী নয়। কারণ হচ্ছে টমেটো

একটি স্ব-পরাগায়ন গাছ, গ্রীষ্মকালে গরমের কারণে পরাগায়ন হতে না পারার জন্য গাছে ফল ধরে না। এছাড়া গ্রীষ্মকালে টমেটো গাছে অনেক পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমন হয়। এ সমস্যাগুলি সমাধান করে গরম-সহিষ্ণু টমেটোর জাত উদ্ভাবনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ ১৯৯৬ সালের দিকে কাজ শুরু করেন এবং এমন জাতের সৃষ্টি করেন যেন এ দুটি সমস্যা প্রবল হতে না পারে। বিজ্ঞানীগণ তাদের নিজস্ব খামারে এবং কৃষক পর্যায়ে এর চাষ করে নিশ্চিত হয়ে এটি চাষাবাদের জন্য সুপারিশ করেন। বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ করে যশোর, গাইবান্ধা এলাকায় এর চাষ শুরু করা হয়। এতে ভাল ফলন পাওয়া যায়। বাংলাদেশ সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ ডিপার্টমেন্ট Second Crop Diversification Project এর আওতায় কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক হারে চাষ করার জন্য গ্রীষ্মকালীন টমেটোকে প্রথম অন্তর্ভুক্ত করেন। এই প্রকল্পটি ২৭টি জেলার ৫২টি উপজেলায় বিভিন্ন ধরনের উচ্চ মূল্যের ফসল চাষের উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে গৃহীত হলেও মাঠ পর্যায়ে এর কাজ শুরু করা হয় ফেব্রুয়ারি ২০১২ সালে। তখনই অন্যান্য ফসলের সাথে কৃষকগণ গ্রীষ্মকালীন টমেটোরও চাষ করে সফলতা অর্জন করেন। তারপর থেকেই গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পায় এবং এই ফসলের চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আমাদের আগ্রহের আর একটি কারণ হচ্ছে, গ্রীষ্মকালে টমেটোর চাষ বেশ জটিল এবং ব্যয় বহুল। এজন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও ব্যয় নির্বাহের মূলধন থাকা প্রয়োজন। তাই কৃষক পর্যায়ে চাষ পদ্ধতি ও আয়-ব্যয়ের হিসাব নিবিড়ভাবে দেখতে চাই আমরা। এই উদ্দেশ্যে ২০২২ সালের প্রথম দিকে সিদীপের এসএমএপি (ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক আকারের কৃষকদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বহুমুখীকরণ অর্থায়ন প্রকল্প) প্রকল্পের আওতায় যারা গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চাষ করেছেন এমন দু'জন কৃষক বাছাই করি। এদের একজন মনির হোসেন। কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার পিহর গ্রামের বাসিন্দা। মনির হোসেনের কোন চাষের জমি নাই। অন্যের জমি বর্গা/লিজ নিয়ে চাষ করেন। তিনি একজন ভূমিহীন কৃষক। আর একজন মো. কামরুল। তার বাড়ি ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলার চর লালপুর গ্রামে। তিনি একজন ক্ষুদ্র চাষী। পৈতৃক সূত্রে তিনি ১৫০ শতক জমির মালিক। তিনিও জমি বর্গা/লিজ নিয়ে চাষাবাদ করেন। তারা দুজনই যে প্লটে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চাষ করেছেন তা' উঁচু প্রকৃতির জমি এবং এলাকাটি সবজি চাষের উপযোগী। আর এসএমএপি প্রকল্পটি বাছাই করার কারণ হল এ প্রকল্পে মূলত ফসল আবাদ করার জন্য ছোট ও গরীব কৃষকদের ঋণ প্রদান করা হয় এবং চাষাবাদ তদারকি করার জন্য 'উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা' নিয়োজিত আছেন।

আলোচ্য নিবন্ধটির জন্য ফসলসমূহের চাষাবাদ পদ্ধতি এবং আয়-ব্যয়ের সঠিক ও যতটা সম্ভব নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা' এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। একটি ফসল উৎপাদনের জন্য জমি তৈরী শুরু করা থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং প্রত্যেকটি কাজের জন্য যে পমিাণ অর্থ ব্যয় করা হয় সেগুলি লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি 'ছক তৈরী করা হয়। এই ছক অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের পূর্বেই গবেষণা'র উদ্দেশ্যে তাদের চাষবাস ও আয়-ব্যয়ের হিসাব নেওয়া হবে বলে তাদের অনুমতি গ্রহণ করা হয়। এ মর্মে তাদের কার্যক্রম ও হিসাব প্রতিদিন একটি খাতায় লিখে রাখতে তারা রাজি হন। এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে দু'জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, যারা তাদের কাজকর্ম দেখাশুনার দায়িত্বে রয়েছেন, তারা প্রতি সপ্তাহে একদিন সংশ্লিষ্ট কৃষকের সাথে সাক্ষাৎ করে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে ছকে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং সপ্তাহ শেষে পূরণকৃত ছকটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকলে তা' তখনই জিজ্ঞাসা করে সুরাহা করা হয়।

এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহকালে এক পর্যায়ে দেখা যায় যে, দু'জন কৃষকের মধ্যে একজন মনির হোসেনের গ্রীষ্মকালীন টমেটো রোপণের ৫ মাস পর যখন তার টমেটো ফসল পুরোদমে তুলে বিক্রি হচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে ১৫-১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে টানা ৩ দিনের বৃষ্টিতে তার সমগ্র ফসল নষ্ট হয়ে যায়। মনির হোসেন শেষ ফসল তোলেন ১৪ সেপ্টেম্বর। অন্যদিকে মো. কামরুলের জমিতে তখন টমেটোর ভরা মৌসুম। এমন পরিস্থিতিতে মনির হোসেন কি করেন তা' নিয়ে পর্যবেক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নেই আমরা। তাই তথ্য সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে মনির হোসেনের প্লটেও। আর এভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই দু'জন কৃষক বছরব্যাপী তাদের জমি কতটা সময় ব্যবহার করেন এবং কতটা সময় পতিত ফেলে রাখেন তা' দেখা যেতে পারে। পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই যে এক বছরে অর্থাৎ ১২ মাসের হিসাবে এটি ঠিক মিলানো যায় না কারণ বছর শেষে একজনের (মনির হোসেন) জমিতে ফসল (করলা) তোলা

এই নিবন্ধটির জন্য যাবতীয় তথ্যাদি দিয়ে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন যে দু'জন কৃষক, জনাব মনির হোসেন ও জনাব মো. কামরুল, তাদের দু'জনকে এই সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, তাদের সহযোগিতা ছাড়া এই নিবন্ধটি লিখা সম্ভব হতো না। তাদের কাছ থেকে প্রতি সপ্তাহে যে দু'জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, জনাব মো. শামীম হোসেন এবং জনাব মো. ফায়সাল হোসেন, যেভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন ও যোগাযোগ রক্ষা করেছেন সেজন্য তাদের দু'জনকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শেষ হলেও অন্যজনের (মো. কামরুল) প্লটে ফসল (ক্যাপসিকাম) ফলন্ত অবস্থায় থাকে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে এই দু'জন কৃষকের প্লট দু'টিতে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলতে থাকবে। সে অনুযায়ী ২০২৪ সালের জুন মাসে এসে দেখা যায় যে মনির হোসেনের শশা ও মো. কামরুলের করল্লা ফসল কাটা শেষ হয় এবং দু'জনের প্লটই ফসলশূন্য হয়ে যায় এবং আমরাও তথ্য সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত করি। এতে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলে ২০২২ সালের মধ্য এপ্রিল থেকে ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত অর্থাৎ ৮০০ দিন বা ২৬ মাস ২০ দিন। আমরা দেখতে পাই যে এই সময়ের মধ্যে মনির হোসেনের প্লটে ফসল ছিল মোট ৭২১ (৯০%) দিন আর পতিত ছিল ৭৯ (১০%) দিন এবং মো. কামরুলের প্লটে ফসল ছিল ৬৩৩ (৮০%) দিন ও পতিত ছিল ১৮৭ (২০%) দিন। আরও দেখা যায় যে উল্লেখিত সময়ে মনির হোসেন ফসল চাষ করেছেন ৭টি এবং মো. কামরুল করেছেন ৫টি ফসল। যেহেতু আমরা এই ২৬ মাস ২০ দিন ধরেই সাপ্তাহিক ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করেছি এই (৭+৫) = ১২টি ফসলের সেহেতু এই সময়ের মধ্যে এই দু'জন কৃষকের এই দুটি প্লটে কোন কোন সময়ে কী কী ফসল ছিল এবং এক ফসল থেকে আরেক ফসল লাগানোর সময়ে কতদিন প্লট খালি/পতিত অবস্থায় ছিল তার একটি বর্ণনা আমরা তুলে ধরেছি নিচের এই তালিকাতে এবং চিত্রে।

মো. কামরুলের ক্ষেত্রে

ক্র. নং	ফসলের নাম	ফসল জমিতে থাকার সময় (তারিখ)	জমিতে ফসল থাকার সময় (দিন)	জমি খালি থাকার সময় (তারিখ)	জমি খালি থাকার সময় (দিন)
০১	গ্রীষ্মকালীন টমেটো	১৬-০৪-২০২২ থেকে ২০-১১-২০২২	২১৯	২১-১১-২০২২ থেকে ১৫-০৩-২০২৩	১১৫
০২	ক্যাপসিকাম	১৬-০৩-২০২৩ থেকে ০৫-০৫-২০২৩	৫১	০৬-০৫-২০২৩ থেকে ২৪-০৫-২০২৩	১৯
০৩	ক্যাপসিকাম	২৫-০৫-২০২৩ থেকে ২৪-১০-২০২৩	১৫৩	২৫-১০-২০২৩ থেকে ০৯-১১-২০২৩	১৬
০৪	মরিচ	১০-১১-২০২৩ থেকে ১৫-০২-২০২৪	৯৮	১৬-০২-২০২৪ থেকে ০৩-০৩-২০২৪	১৭
০৫	করলা	০৪-০৩-২০২৪ থেকে ২৩-০৬-২০২৪	১১২	-	-
		সর্বমোট	**৬৩৩**		**১৬৭**

মনির হোসেনের ক্ষেত্রে

ক্র. নং	ফসলের নাম	ফসল জমিতে থাকার সময় (তারিখ)	জমিতে ফসল থাকার সময় (দিন)	জমি খালি থাকার সময় (তারিখ)	জমি খালি থাকার সময় (দিন)
০১	গ্রীষ্মকালীন টমেটো	১৬-০৪-২০২২ থেকে ১৪-০৯-২০২২	১৫২	১৫-০৯-২০২২ থেকে ০৯-১০-২০২২	২৫
০২	ধনিয়া	১০-১০-২০২২ থেকে ১০-১১--২০২২	৩২	১১-১১-২০২২ থেকে ১৫-১১-২০২২	৫
০৩	করলা	১৬-১১-২০২২ থেকে ১৭-০৪-২০২৩	১৫৩	১৮-০৪-২০২৩ থেকে ২৪-০৪-২০২৩	৭
০৪	মরিচ	২৮-০৭-২০২৩ থেকে ১৭-১০-২০২৩	৮২	১৮-১০-২০২৩ থেকে ০১-১১-২০২৩	১৫
০৫	ঢেঁড়শ	০২-১১-২০২৩ থেকে ০৭-০২-২০২৪	৯৮	০৮-০২-২০২৪ থেকে ২২-০২-২০২৪	১৫
০৬	শশা	২৩-০২-২০২৪ থেকে ২৩-০৬-২০২৪	১২২	১১-১১-২০২২ থেকে ১৫-১১-২০২২	৫
		সর্বমোট	**৭২১**		**৭৯**

মনির হোসেনের ক্ষেত্রে
(এপ্রিল' ২২ - জুন' ২৪)

গ্রীষ্মকালীন টমেটো	১৫২ দিন
ফসলহীন	২৫ দিন
ধনিয়া	৩২ দিন
ফসলহীন	৫ দিন
করলা	১৫৩ দিন
ফসলহীন	৭ দিন
চিচিঙ্গা	৮২ দিন
ফসলহীন	১২ দিন
মরিচ	৮২ দিন
ফসলহীন	১৫ দিন
ঢেঁড়শ	৯৮ দিন
ফসলহীন	১৫ দিন
শশা	১২২ দিন

মোট ৮০০ দিন

জমিতে ফসল ছিল ৭২১ দিন

জমি খালি ছিল ৭৯ দিন

মো. কামরুলের ক্ষেত্রে
(এপ্রিল' ২২ - জুন' ২৪)

গ্রীষ্মকালীন টমেটো	২১৯ দিন
ফসলহীন	১১৫ দিন
ক্যাপসিকাম	৫১ দিন
ফসলহীন	১৯ দিন
ক্যাপসিকাম	১৫৩ দিন
ফসলহীন	১৬ দিন
মরিচ	৯৮ দিন
ফসলহীন	১৭ দিন
করলা	১১২ দিন

মোট ৮০০ দিন

জমিতে ফসল ছিল ৬৩৩ দিন

জমি খালি ছিল ১৬৭ দিন

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে এই সময়ের মধ্যে দু'জন কৃষকের মোট ১২টি ফসলের চাষাবাদ পদ্ধতি ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি। তাতে দেখতে পাই যে প্রথম ৭ মাসে ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মনির হোসেন ফসল তুলেছেন গ্রীষ্মকালীন টমেটো ও ধনিয়া এবং মো. কামরুল তুলেছেন শুধু গ্রীষ্মকালীন টমেটো। এই তিনটি ফসলের চাষাবাদ পদ্ধতি ও আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ে এই পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

মনির হোসেন ও মো. কামরুলের গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চাষবাস এবং আয়-ব্যয়

ভূমিকা

২০২২ সালটা কৃষক মনির হোসেন ও মো. কামরুল দুজনের জন্যই ছিল বিশেষ, কারণ দুজনেই প্রথমবারের মত গ্রীষ্মকালীন টমেটো নিয়ে চাষ শুরু করেছে। দুজনের স্বপ্ন ছিল এক তবে তাদের চাষের পদ্ধতিতে ছিল নানা পার্থক্য। কৃষি ছিল তাদের জীবনের মূল সুর। মাটির গন্ধ, ফসলের সবুজ শোভা আর সূর্যের আলোয় সোনালী হয়ে ওঠা মাঠের প্রতি তাদের ছিল গভীর টান। এখানে বলে রাখা ভালো মো. কামরুল জীবনের এক দশক কাটিয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কুয়েতের একটি খামারে। গরম মরুভূমির দেশে বসেও কিভাবে আধুনিক প্রযুক্তি আর যত্নশীল পরিকল্পনার মাধ্যমে সবুজ ফসল ফলানো যায় তা তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। সেচ পদ্ধতির নতুন ব্যবহার, মাটির গুনাগুন বাড়ানোর জন্য জৈব সারের ব্যবহার আর উচ্চফলনশীল বীজ– এসবই তাকে চাষাবাদের নতুন পথ দেখিয়েছে। অন্যদিকে মনির হোসেন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কখনোই পায় নি তবে কৃষির প্রতি তার আগ্রহ প্রচণ্ড। লেখাপড়া না জেনেও আধুনিক কৃষি নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায়, ভালো বীজ কোথা থেকে

সংগ্রহ করা যায় এ সমস্ত বিষয় নিয়ে মনির হোসেন অবসরে সব সময়ই ইউটিউবে ঘাঁটাঘাঁটি করতেন এবং জানা ও বোঝার চেষ্টা করতেন। মনির হোসেন মূলত এই ইউটিউবের মাধ্যমে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষাবাদে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

জমির মালিকানা ও পেশা

মো. কামরুল পৈতৃকভাবে মোট সম্পত্তি পেয়েছেন ১৫০ শতাংশ এবং এই জমিটুকুর মধ্যে তিনি ৮ শতাংশ বসতভিটা হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন এবং বাকি ১৪২ শতক জমি কৃষি কাজে ব্যবহার করেন। বর্তমানে তিনি কৃষি কাজ করছেন সর্বমোট ৫৯২ শতক জমিতে। তার পৈত্রিক ১৪২ শতক জমির সঙ্গে তিনি লিজ নিয়েছেন ৪৫০ শতক। এই জমিতে তিনি নানা ধরনের ফসলাদি চাষাবাদ করেন যেমন ক্যাপসিকাম, মরিচ, বেগুন, করলা, শশা, কচু লতি, গ্রীষ্মকালীন টমেটো ইত্যাদি। মো. কামরুল এ বছর একটি বিশেষ সবজি এর মধ্যে চাষ করেছেন যা হলো গ্রীষ্মকালীন টমেটো।

জীবন সংগ্রামে একজন লড়াকু ও স্বপ্নবান কৃষকের নাম মনির হোসেন। মনির হোসেনের পরিচয় তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ কৃষক। তার কৃষি ছাড়া অন্য কোন আয়ের উৎস নাই। কৃষিই তার বেঁচে থাকার মূল উৎস। মনির হোসেন পৈতৃকভাবে মোট সম্পত্তি পেয়েছেন ৫ শতাংশ এবং এই জমিটুকু তিনি বসতভিটা হিসেবেই ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমানে মনির হোসেন কৃষি কাজ করছেন সর্বমোট ৩২০ শতক জমিতে। এর মধ্যে বর্গা নিয়েছেন ৯০ শতক, লিজ নিয়েছেন ১৭০ শতক, বন্ধক নিয়েছেন ৬০ শতক সর্বমোট ৩২০ শতক। এই জমিতে তিনি নানা ধরনের ফসলাদি চাষাবাদ করেন। যেমন ধান, বেগুন, ধনিয়া, করলা, শশা, চিচিঙ্গা ইত্যাদি। মনির হোসেন এ বছর একটি বিশেষ সবজি এর মধ্যে চাষ করেছেন যা হলো গ্রীষ্মকালীন টমেটো। জমির মালিকানার দিক থেকে মনির হোসেন একজন ভূমিহীন কৃষক ও মো. কামরুল একজন ক্ষুদ্র কৃষক।

মো. কামরুল ও মনির হোসেন দুজনেরই প্রধান পেশা হচ্ছে কৃষি। কৃষি ব্যতীত তাদের অন্য কোন আয়ের উৎস নেই। আগেই বলেছি মনির হোসেনের চাষের জন্য নিজস্ব কোন জমি নেই , তিনি একজন ভূমিহীন কৃষক। তিনি ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন এবং দিনের পুরো সময়টিই তার জমিতে বা কৃষি কাজের জন্য ব্যয় করেন। অন্যদিকে মো. কামরুল ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি ৭-১-২০০৫ তারিখে বিদেশ চলে যান। মো. কামরুল ৯-৩-২০১৪ তারিখে বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং পুরোপুরি কৃষিকাজের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তারা দুজনেই সিদীপ সমিতির সদস্য। মনির হোসেনের স্ত্রী সেলিনা বেগম পিহর মহিলা সমিতি (০০০৭) এবং মো. কামরুলের স্ত্রী ববি আক্তার লালপুর মহিলা সমিতি (০০১৫) এর সদস্য।

পারিবারিক পরিচয়

মনির হোসেনের ৪ জনের ছোট পরিবার। মনির হোসেনের স্ত্রী সেলিনা বেগমের বয়স ৩৮ এবং পেশায় গৃহিণী, পুত্র মো. তারেক হোসেনের বয়স ২২ বছর, পেশায় কৃষক। তারেক তার পিতা মনির হোসেনকে কৃষি কাজে সার্বক্ষনিক সহযোগিতা করে থাকে এবং পুত্রবধু সালমা বেগম একজন গৃহিণী, বয়স ১৮ বছর। মনির হোসেনের বয়স ৪২ বছর। অন্যদিকে মো. কামরুলের ০৬ জনের পরিবার। মো. কামরুলের পিতা জনাব মো. ফিরোজ মিয়া বয়স ৬৫ বছর, মাতার নাম মনছুরা বেগম বয়স ৫৫ বছর। স্ত্রী ববি আক্তার

মনির হোসেন

মো. কামরুল

বয়স ৩২ বছর এবং পেশায় গৃহিণী, বড় ছেলের নাম ইয়াছিন খান ক্লাস ওয়ানে পড়ে এবং ছোট ছেলের নাম রায়িন খান বয়স ১.৫ বছর। মো. কামরুলের বয়স ৩৭ বছর।

এবারে মো. কামরুল ও মনির হোসেনের ২০২২ সালে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে জেনে নেওয়া যাক টমেটো চাষের উৎপত্তি এবং গ্রীষ্ম মৌসুমে টমেটো চাষের প্রতিবন্ধকতাগুলি কী।

টমেটো চাষের উৎপত্তি ও গ্রীষ্মকালে চাষের সমস্যা

আনুমানিক ৭০০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় টমেটো প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে টমেটো ধীরে ধীরে ইউরোপসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম মূলত রোপণ করা হত আফ্রিকা, মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকার মত জায়গায়। ধীরে ধীরে তা ইউরোপ সহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পায়। সোলানেসি পরিবারের ফসলগুলোর মধ্যে টমেটো অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বেগুনের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে Solanum Malongena, টমেটোর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে Solanum Lycopersicum এবং টমেটো ও বেগুন একই পরিবার অর্থাৎ Solanace গোত্রের। টমেটো হচ্ছে একটি দিন নিরপেক্ষ ফসল যা গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতকালীন সময়ে রোপন করা যায়। তবে গ্রীষ্মকালীন টমেটো মৌসুম ভেদে বিভিন্ন রকম রোগবালাই ও আবহাওয়ার মাধ্যমে আক্রান্ত হয়ে থাকে যা তুলনামূলকভাবে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বেশি হয়ে থাকে। টমেটো সাধরণত একটি নিজ পরাগায়ন ফসল। যখন রোদের তাপমাত্রা ৯০০ ফারেনহাইটের বেশি হয়ে যায় তখন টমেটো তার ডিম্বানু তৈরী করতে পারে না যার জন্য ফল আসে না। টমেটোর রাত্রিকালীন সময়ে পরাগায়ন করাটাও অনেক সংবেদনশীল। রাত্রিকালীন সময়ে তাপমাত্রা যদি ৭০০ ফারেনহাইটের নিচে চলে না আসে তাহলে টমেটোর পরাগায়ন সম্ভব হয় না। এছাড়াও গ্রীষ্মকালে টমেটো চাষ করলে বিভিন্ন রোগবালাই আক্রমণ করে, যেমন - ব্লসম এন্ড রট যা টমেটোর ফুলে আক্রমণ করে এবং ফুল প্রস্ফুটিত হবার পূর্বে ঝরে যায়, টমেটোর অভ্যন্তর পাকার সাথে সাথে টমেটোর অভ্যন্তরে অ্যামোল্ড বাড়তে থাকে এর ফলে টমেটোর বাইরে কাঁচা অবস্থায় থেকে যায় যা ফ্রুট রট হিসেবে পরিচিত, আর্লি ব্লাইট যা পাতাগুলোকে কুচকে দেয়, পাতা হলুদ বর্ণের হয়ে যায় এবং কালো দাগের মত টমেটোর গুল্মগুলিতে দেখতে পাওয়া যায় । আর্লি ব্লাইট বা প্রারম্ভিক ব্লাইট একটি ছত্রাক। ঘনকেন্দ্রিক রিং সহ পাতায় গাঢ় বাদামী থেকে কালো দাগ হয় যা সাধারণত পাতার নিচ থেকে শুরু হয় এবং গাছের বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়।

এই জন্য বিশ্বের উদ্ভিদ শিল্পের গবেষণাবিদরা একটি শ্রমসাধ্য গবেষনা পরিচালনা করেছেন বিশেষ করে অফ সিজনে (গ্রীষ্মকালে) টমেটো উৎপাদন কিভাবে উন্নত করা যায় তা নিয়ে ফিলিপাইনের লস ব্যানোস ন্যাশনাল ক্রপ রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যুরো গবেষণাগারে টমেটো অফ সিজনে উৎপাদনের জন্য একটি নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে। অফ সিজনে টমেটো উৎপাদনের এই প্রযুক্তি এখন প্রায় সারাবিশ্বেই ব্যবহৃত হচ্ছে। যে সমস্ত কৃষক গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদন করতে চায় তাদের জন্য এটি একটি লাভজনক ফসল।

নির্বাচিত দুজন কৃষক যে চারা ব্যবহার করেছেন

মো. কামরুল ও মনির হোসেন যে জাতের চারা দিয়ে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করেছেন তা হলো বারি হাইব্রিড ৮ বা বারি-৮ ও তিত বেগুনের গ্রাফটিং করা চারা। বেগুনের রুটস্টকের সাথে টমেটোর সায়ন গ্রাফটিং করা চারা টমেটোর ব্যাকটেরিয়া উইল্ট রোগ, এছাড়াও মাটির বিভিন্ন অনুজীব আক্রমণ করতে পারে না। গবেষণায় দেখা যায় যে এই গ্রাফটিং করার চারার উৎপাদনশীলতা সাধারণ টমেটোর চেয়ে প্রায় ২১% বেশি থাকে। গ্রাফটিং প্রসেস সাধারণভাবেই করা হয়ে থাকে। বেগুন ও টমেটো একই ফ্যামিলির হওয়ায় যথা সোলানেসি ফ্যামিলির হওয়ায় এই গ্রাফটিং সম্ভব হয়েছে। বেগুনের রুটস্টকে বয়স হতে হবে টমেটোর চেয়ে ৫-৭ দিনের বয়সের বেশি। বেগুনের চারার বয়স হতে হবে ৩-৪

সপ্তাহ এবং টমেটোর চারার বয়সের চেয়ে ১ সপ্তাহ কম হতে হবে। একটি পরিশোধিত ব্লেড দিয়ে ৭০-৮০ ডিগ্রী বাঁকে প্রথম দুই পাতার উপরে রুটস্টক ও সায়ন কাটতে হবে (রুটস্টক ও সায়ন একই সাইজের হতে হবে)। ১০ মিলিমিটার লম্বা ও ১-১.৫ সেমি ব্যাসযুক্ত রাবার টিউবিং দিয়ে সায়ন ও রুটস্টকের কাটা অংশ একে অপরের সাথে বাঁধতে হবে। পরবর্তীতে গ্রাফটিং চারাগুলো একটি আর্দ্রতা চেম্বারে রাখতে হবে এবং সম্পূর্ণ কালো জালের আচ্ছাদনসহ একটি শীতল শুষ্ক জায়গায় ৪-৭ দিনের জন্য স্থানান্তর করতে হয়। এরপরে এই গ্রাফটিং চারাগুলো লাগানোর জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়। এখানে বেগুনের রুটস্টক এর জন্য ইজি-২০৩ ব্যবহার করা হয়েছিল যা পরীক্ষা করে দেখা যায় টমেটোর জন্য মারাত্মক রোগবালাই যেমন ব্যাকটেরিয়া উইল্ট এবং অন্যান্য মাটির মাধ্যমে জন্ম নেয়া বিভিন্ন ক্ষতিকর অনুজীব এই রুটস্টককে আক্রমণ করতে পারে না। পরবর্তীতে এই পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী আরও আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং বাংলাদেশেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৩০ সালে জাপানে শতকরা ৯৫ ভাগ বেগুন চাষী কলমকৃত বেগুন গাছ রোপণ করেন। জাপানী প্রকল্প CVSRC এর আওতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)-র বিজ্ঞানীগন ১৯৮২ সালে বাংলাদেশে বেগুনের জোড়া কলম প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেন। পরবর্তীতে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে BSMRAU) জোড় কলম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ১৯৯৮ সালে IPM-CSRP প্রকল্পের আওতায় বারি'তে জোড় কলম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুন ও টমেটোর চাষাবাদ পরীক্ষা আকারে শুরু হয়। পরীক্ষাটি সফলজনকভাবে সমাপ্তির পর গাজীপুরের কাশিমপুরে কৃষকের মাঠে পরীক্ষাটি প্রদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তা আরো আধুনিক ও দেশব্যাপী বিস্তৃত হতে থাকে।

এই পদ্ধতি ধীরে ধীরে সারা দেশে কৃষকদের মধ্যে ও নার্সারি মালিকদের কাছেও জনপ্রিয় হতে থাকে। এখন বাংলাদেশের কিছু নার্সারি এই গ্রাফটিং করা চারা বিক্রি করছে এবং কৃষক মনির হোসেন ও কামরুল হোসেন এই গ্রাফটিং করা চারাই তাদের জমিতে রোপন করেছিল।

মনির হোসেন গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষাবাদের জন্য কোন সংস্থা বা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেননি। তিনি তার পূর্বের কৃষিকাজ থেকে আয়কৃত টাকা দিয়েই গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষাবাদ করেছেন। অন্যদিকে মো: কামরুল গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষাবাদের জন্য ৩০-৫-২০২২ তারিখে এসএমএপি প্রকল্পের আওতায় ৫০,০০০ টাকা সবজি চাষ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ২৭-১০-২০২২ ইং তারিখে এসএমএপি প্রকল্পের আওতায় ৫০,০০০ টাকা সবজি চাষ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেছেন।

গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে জমির পরিমাণ

মনির হোসেন গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করেছেন ৭২ শতক জমিতে যা তার জন্য ছিল একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত। মনির হোসেন মূলত ইউটিউব দেখে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষাবাদে অনেকটা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। চারা কোথায় এবং কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে তাও তিনি ইউটিউবের মাধ্যমেই জেনেছেন। গ্রীষ্মকালীন টমেটো হলো এমন একটি ফসল যা আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি এবং সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে চাষাবাদ করতে পারলে এটি অত্যন্ত লাভজনক একটি কৃষিকাজ। তিনি ইউটিউবে দেখতে পারেন যে তিত বেগুন চারার সাথে গ্রাফটিং করে টমেটা চারা লাগানো হয় এবং এর মাধ্যমে টমেটো উৎপন্ন হয়। এই বিষয়টি তার খুব ভালো লাগে। তিনি জানতে পারেন এ ধরনের চারা সিলেটের হবিগঞ্জে মেজর নার্সারিতে বিক্রি করা হয়। অন্যদিকে মো. কামরুল গ্রীষ্মাকলীন টমেটো চাষ করেছেন ৬০ শতক জমিতে। তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গ্রীন নার্সারি থেকে এই গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চারা সংগ্রহ করেছেন।

তারা যেভাবে এই গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষাবাদ করেছেন তার পূর্ণ প্রক্রিয়া অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিম্নে প্রদান করা হলো। এখানে উল্লেখ্য যে, সমস্ত উপকরণের পরিমাণ এবং ব্যয়ের টাকার পরিমাণ মনির হোসেনের বেলায় ৭২ শতক এবং মো. কামরুলের বেলায় ৬০ শতক জমি হিসেবে গণ্য করতে হবে। তারা দুজনই প্রতি সপ্তাহে যে হিসাব দিয়েছেন আমরা এখানে তা উল্লেখ করেছি। লেখাটির শেষে এই হিসাবের সারাংশটি একর প্রতি রূপান্তর করে দেখানো হয়েছে। *(চলবে...)*

লেখক: প্রতাপ চন্দ্র রায়, কৃষি কর্মকর্তা, সিদীপ এবং ফজলুল বারি, সম্পাদক, শিক্ষালোক

জমিতে চারা রোপন কার্যক্রম

হেলাল হাফিজের

নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়

এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।

মিছিলের সব হাত
কণ্ঠ
পা এক নয়।
সেখানে সংসারী থাকে, সংসার বিরাগী থাকে,
কেউ আসে রাজপথে সাজাতে সংসার
কেউ আসে জ্বালিয়ে বা জ্বালাতে সংসার।

শাশ্বত শান্তির যারা তারাও যুদ্ধে আসে
অবশ্য আসতে হয় মাঝে মধ্যে
অস্তিত্বের প্রগাঢ় আহ্বানে,
কেউ আবার যুদ্ধবাজ হয়ে যায় মোহরের প্রিয় প্রলোভনে।

কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনী হতে হয়।
যদি কেউ ভালোবেসে খুনী হতে চান
তাই হয়ে যান
উৎকৃষ্ট সময় কিন্তু আজ বয়ে যায়।
এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।

১.২.১৯৬৯
(কাব্যগ্রন্থ: যে জলে আগুন জ্বলে)

রাখালের বাঁশি

কে আছেন?
দয়া করে আকাশকে একটু বলেন–
সে সামান্য উপরে উঠুক,
আমি দাঁড়াতে পারছি না

(কাব্যগ্রন্থ: বেদনাকে বলেছি কেঁদো না)

আছি

আছি।
বড় জানান দিতে ইচ্ছে করে,–
আছি,
মনে ও মগজে
গুন্ গুন্ করে
প্রণয়ের মৌমাছি

(কাব্যগ্রন্থ: বেদনাকে বলেছি কেঁদো না)

অশ্লীল সভ্যতা

নিউট্রন বোমা বোঝো
মানুষ বোঝো না!

২৮.৬.৮০
(কাব্যগ্রন্থ: যে জলে আগুন জ্বলে)

ইচ্ছে ছিলো

ইচ্ছে ছিলো তোমাকে সম্রাজ্ঞী করে সাম্রাজ্য বাড়াবো
ইচ্ছে ছিলো তোমাকেই সুখের পতাকা করে
শান্তির কপোত করে হৃদয়ে উড়াবো।

ইচ্ছে ছিলো সুনিপুণ মেকআপ-ম্যানের মতো
সূর্যালোকে কেবল সাজাবো, তিমিরের সারাবেলা
পৌরুষের প্রেম দিয়ে তোমাকে বাজাবো, আহা তুমুল বাজাবো।

ইচ্ছে ছিলো নদীর বক্ষ থেকে জলে জলে শব্দ তুলে
রাখবো তোমার দুই লাজুক চঞ্চুতে,
জন্মাবধি আমার শীতল চোখ
তাপ নেবে তোমার দু'চোখে।

ইচ্ছে ছিলো রাজা হবো
তোমাকে সম্রাজ্ঞী করে সাম্রাজ্য বাড়াবো,
আজ দেখি রাজ্য আছে
রাজা আছে
ইচ্ছে আছে,
শুধু তুমি অন্য ঘরে।

৭.২.৭৩
(কাব্যগ্রন্থ: যে জলে আগুন জ্বলে)

কবিতা

জটিল জ্যামিতি

হয়তো তোমাকে হারিয়ে দিয়েছি
নয়তো গিয়েছি হেরে
থাক না ধ্রুপদী অস্পষ্টতা
কে কাকে গেলাম ছেড়ে

(কাব্যগ্রন্থ: বেদনাকে বলেছি কেঁদো না)

পথ

যদি যেতে চাও, যাও
আমি পথ হবো চরণের তলে
না ছুঁয়ে তোমাকে ছোঁব
ফেরাবো না, পোড়াবোই হিমেল অনলে

(কাব্যগ্রন্থ: বেদনাকে বলেছি কেঁদো না)

অন্যরকম সংসার

এই তো আবার যুদ্ধে যাবার সময় এলো
আবার আমার যুদ্ধে খেলার সময় হলো
এবার রানা তোমায় নিয়ে আবার আমি যুদ্ধে যাবো
এবার যুদ্ধে জয়ী হলে গোলাপ বাগান তৈরি হবে।

হয় তো দু'জন হারিয়ে যাবো ফুরিয়ে যাবো
তবুও আমি যুদ্ধে যাবো তবু তোমায় যুদ্ধে নেবো
অন্যরকম সংসারেতে গোলাপ বাগান তৈরি করে
হারিয়ে যাবো আমরা দু'জন ফুরিয়ে যাবো।

স্বদেশ জুড়ে গোলাপ বাগান তৈরি করে
লাল গোলাপে রক্ত রেখে গোলাপ কাঁটায় আগুন রেখে
আমরা দু'জন হয় তো রানা মিশেই যাবো মাটির সাথে।

মাটির সাথে মিশে গিয়ে জৈবসারে গাছ বাড়াবো
ফুল ফোটাবো, গোলাপ গোলাপ স্বদেশ হবে
তোমার আমার জৈবসারে। তুমি আমি থাকবো তখন
অনেক দূরে অন্ধকারে, অন্যরকম সংসারেতে।

২০.১২.৭৩
(কাব্যগ্রন্থ: যে জলে আগুন জ্বলে)

যেভাবে সে এলো

অসম্ভব ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছিলো,
সামনে যা পেলো খেলো,
যেন মন্বন্তরে কেটে যাওয়া রজতজয়ন্তী শেষে
এসেছে সে, সবকিছু উপাদেয় মুখে।

গাভিন ক্ষেতের সব ঘ্রাণ টেনে নিলো,
করুণ কার্নিশ ঘেঁষে বেড়ে ওঠা লকলকে লতাটিও খেলো,
দুধাল গাভীটি খেলো
খেলো সব জলের কলস।

শানে বাঁধা ঘাট খেলো
সবুজের বনভূমি খেলো
উদাস আকাশ খেলো
কবিতার পাণ্ডুলিপি খেলো।

দু'পায়া পথের বুক, বিদ্যালয়
উপাসনালয় আর কারখানার চিমনি খেলো
মতিঝিলে স্টেটব্যাংক খেলো।

রাখালের অনুপম বাঁশিটিকে খেলো,
মগড়ার তীরে বসে চাল ধোয়া হাতটিকে খেলো।

স্বাধীনতা সব খেলো, মানুষের দুঃখ খেলো না।

(কাব্যগ্রন্থ: কবিতা একাত্তর)

বাসনা

আগামী, তোমার হাতে
আমার কবিতা যেন
থাকে দুধে-ভাতে।

(কাব্যগ্রন্থ: বেদনাকে বলেছি কেঁদো না)

কবিসূত্র

আজন্ম মানুষ আমাকে পোড়াতে পোড়াতে কবি করে তুলেছে
মানুষের কাছে এও তো আমার এক ধরনের ঋণ।
এমনই কপাল আমার
অপরিশোধ্য এই ঋণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

(কাব্যগ্রন্থ: বেদনাকে বলেছি কেঁদো না)

কবির জন্য ভালোবাসা

সৈকত হাবিব

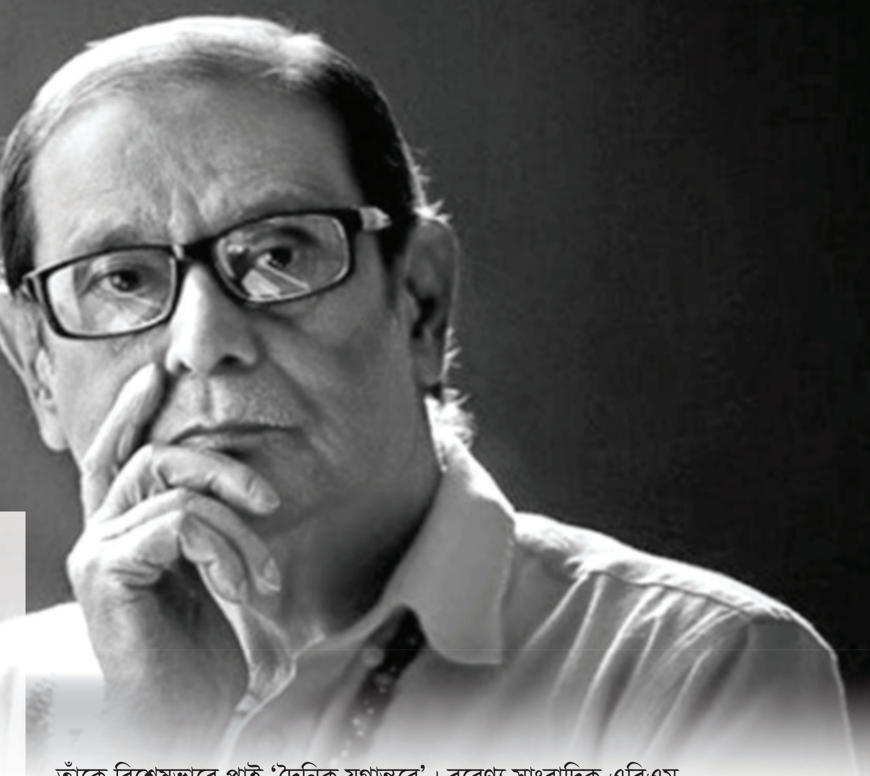

একটিমাত্র বই দিয়ে যে চিরকালের জন্য পাঠকের হৃদয় জয় করে নেওয়া যায়, এমন দৃষ্টান্ত হয়তো বিশ্বকবিতাতেই সুলভ নয়, তায় বাংলাদেশ।

আর সেই দৃষ্টান্তই তৈরি করেছিলেন কবি হেলাল হাফিজ তাঁর 'যে জলে আগুন জ্বলে' কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে। ১৯৮৬ সালে প্রথম প্রকাশের পর এ পর্যন্ত এর প্রায় তিরিশটি মুদ্রণ হয়েছে। বাংলাদেশে কোনো কাব্যগ্রন্থের জন্য এ ঘটনা বিস্ময়কর। প্রচ্ছদেও এসেছে তিনবার পরিবর্তন। এতে বোঝা যায়, দেশের কবিতার পাঠকদের কয়েক প্রজন্ম, গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে, এই কবিকে তাদের অতি আপনজন করে নিয়েছেন। এই বেদনার্ত কবিকে হৃদয়ে নিবিড় স্থান দিয়েছেন।

যতদূর মনে পড়ছে, ১৯৮৯-৯০ সালের দিকে যশোরে আমার বন্ধু জুয়েল এই বইটি পাঠে প্রথম অনুপ্রাণিত করে। আজ এতটা বছর পরে এসে মনে পড়ছে প্রথম তারুণ্যে এই বই পাঠের অভিঘাত ছিল কত তীব্র। এর সঙ্গে সে সময় তুলনীয় আর মাত্র দুটি বই : জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' আর নির্মলেন্দু গুণের 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই'। সে সময় এমনিতেও অনেক কবির কবিতা পড়তাম, অনেকটা গ্রন্থ ধরে ধরেই। অনেকের অনেক কবিতা ভালো লাগলেও পুরো বই ভালো লাগার ঘটনা বেশ ব্যতিক্রম। এ তিনটি বই ছিল সেই ব্যতিক্রমের অংশ। কখনো ভুলব না প্রথম কবিতাটি পাঠের সেই অভিঘাত : 'এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়/এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।' কিংবা মাত্র দু লাইনের কবিতা 'নিউট্রন বোমা বোঝ/মানুষ বোঝ না!'

আর তাঁকে প্রথম দেখিও যশোরেই। কাছাকাছি সময়ে অনুষ্ঠিত যশোর সাহিত্য সম্মেলনে। 'পরিণত যৌবনে'র যে ছবি এখন ছাপা হয় বইটিতে দেখতে অনেকটা সেরকমই– দুঃখী দুঃখী। যদিও তখন প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়নি। পরে পরিচয় হয় ঢাকায় সাংবাদিকতা করাকালীন। সন-তারিখ মনে নেই। সে সময় তিনি প্রৌঢ়, শ্মশ্রুহীন, সদাহাস্যময়।

তাঁকে বিশেষভাবে পাই 'দৈনিক যুগান্তরে'। বরেণ্য সাংবাদিক এবিএম মূসা সম্পাদক থাকাকালীন ২০০৪ সালে তাঁকে অনেকটা জোর করে নিয়ে আসেন। কারণ তাঁরা ছিলেন ঢাকা প্রেসক্লাবের নিয়মিত সভ্য এবং সেই সূত্রে পরস্পর আত্মার আত্মীয়! সেই সময়ের একটি বিশেষ ঘটনা মনে পড়ছে। তখন যুগান্তরে সাংবাদিকদের কম্পিউটার জানার বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু তিনি তা জানতেন না। কেউ একজন আমার সাহায্য নেওয়ার কথা বলেছিল হয়তো। তিনি আমার সাহায্য চাইলেন। আমি খুব আনন্দের সঙ্গে তাঁকে প্রাথমিক সাহায্য করেছিলাম। কয়েক দিন প্রশিক্ষণে তিনি বেশ আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। কবি বলে কথা!

এক পর্যায়ে প্রথমে তিনি, পরে আমি যুগান্তর ছেড়ে দিই। এরপর যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে যায়। যদিও মাঝেসাজে প্রেসক্লাবে দেখা হতো। তবে ফেসবুকের কল্যাণে ভার্চুয়াল যোগাযোগ ছিল অল্পবিস্তর।

আক্ষরিক অর্থেই একজন কবির জীবন যাপন করে গেছেন তিনি বড় বেদনা ও একাকীত্বের সঙ্গে। মৃত্যুও নিলেন পুরোপুরি একা।

২

কিন্তু আমাদের একটি খেদ রয়ে গেল।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিদীপ-এর একজন কর্মকর্তা, 'শিক্ষালোক' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক কবিবন্ধু আলমগীর খান একদিন ফোন করে জানালেন, তাঁরা শিক্ষালোক-এর একটি সংখ্যায় কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে চান এবং একটি অনুষ্ঠানে কবিকে সম্মাননা জানাতে চান। আমি যেন যোগাযোগ করি। আমি ১২ ডিসেম্বর ম্যাসেন্জারে তাঁকে লিখলাম 'হেলাল ভাই, কেমন আছেন? শরীর এখন কেমন?' তিনি জবাবে জানালেন, 'আমি খুব অসুস্থ।' এরপর 'এখন কোথায় আছেন?' লিখলেও আর কোনো জবাব নেই। তারপর তো সেই দুঃসংবাদ। কবির মহাপ্রয়াণ।

শেষ মিলনের স্বপ্নটা অপূর্ণই থেকে গেল। ভালোবাসার কাঙাল কবির জন্য চির-ভালোবাসা।

লেখক: কবি ও প্রকাশক

পাবনার শতবর্ষী ধোবাখোলা করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ

তোফাজ্জল হোসেন তারা

ধোবাখোলা নামে একটি গ্রাম ছিল ঐ গ্রামের আশেপাশে আরও গ্রাম ছিল যেমন গঙ্গাদিয়া, লক্ষ্মীপুর, ঝাউকান্দা, পাগলার চর, পুকুরপাড় ইত্যাদি। ঐ সব গ্রামের পাশ দিয়ে এক সময়ের প্রমত্তা যমুনা নদী বহমান ছিল। ঐ গ্রামে ছিল ধোপাদের বসবাস। গ্রামে বিস্তর এক মাঠ ছিল যে মাঠে ধোপারা কাপড় চোপড় ধুয়ে শুকাতো। এলাকার ছেলে মেয়েরা নদীতে গোসল করতে গিয়ে আড্ডাস্থলে এক ছেলে বলে ফেলল এই নদীতে লাফ দিতে পারলে তাকে পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াবো। এদিকে নদীতে পানির নিচে মাছ ধরার জন্য দোয়াইর পেতে রাখা হতো। ঐ দোয়াইরের খাটালি পানির নিচে তীর্যক ভাবে খাড়া ছিল। ঐ খাটালি, যে ছেলে লাফ দেয় তার শরীরে বিঁধে যায়। তা দেখে কেউ কেউ হাসি ঠাট্টায় ভেঙে পড়ে আবার কেউ কেউ তড়িঘড়ি ধরাধরি করে চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়। এর জন্য গ্রামে বিচার সালিশ পর্যন্ত করা হয়েছিল। তখন গ্রামে বর্ষা এলে ছেলেমেয়েরা নদী বা সাঁকোর উপর উঠে লাফালাফি করত, ঐ সময় গ্রামেরই এক ভদ্রলোক বাবু শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য দেখলেন যে, এদের মধ্যে শিক্ষার অভাব আছে। তাই একদিন বাবু শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য গ্রাম্য প্রধানদের মাধ্যমে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, গ্রামে একটা স্কুল করা দরকার। বাবু শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি। উনার বাবাদের ছিল জমিদারি। আর উনি ছিলেন গ্রাম্য ডাক্তার। গ্রামে সভা করে সিদ্ধান্ত নিলেন একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করার, ১৯০৬ সালে ধোবাখোলা নামক স্থানে ঐ ফাঁকা জায়গায় কাপড় শুকানো মাঠে জুনিয়র হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। নাম দিলেন "ধোবাখোলা জুনিয়র হাইস্কুল"। বাবু শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠাতা, দাতা গোষ্ঠী আলহাজ্ব আব্দুল খালেক, মো. আবু সাঈদ মিয়া, মো. সিরাজুল ইসলাম। ১৯১২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পূর্ণাঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে অনুমোদন পায়। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ধোবাখোলাতেই স্কুলটি অবস্থান করে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর বাবু শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য সপরিবারে ভারত চলে যান। যাবার সময় স্কুলের খুঁটি জড়ায়ে ধরে শিশুর মত হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলেন। এবং বলেছিলেন বিদ্যালয়টি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য, বিদ্যালয়টি যেন মরে না যায়"। তৎকালীন সময়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট স্ত্রীর জমানো গহনা সীতাহারসহ ১৮ ভরি স্বর্ণালংকার স্কুলের শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য খরচের জন্য রেখে যান। ঐ বছর যমুনা নদীর ভাঙ্গনে গঙ্গাদিয়া গ্রামে স্কুলটি স্থানান্তর করা হয়। ঐ সময় যারা জায়গা জমি ও আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন তাদের মধ্যে জনাব আব্দুল করিম মিয়া, ডাক্তার আব্দুল জব্বার খান, জনাব আকবর আলী খান, জনাব খোরশেদ আলী মিয়া, জনাব সাগর বাবু অন্যতম।

জনাব আব্দুল করিম মিয়া প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত গঙ্গাদিয়া গ্রামে স্কুলটি অবস্থান করে। ১৯৬১ সালে তৃতীয়বারের মত স্কুলটি যমুনা নদীতে আবার ভাঙ্গনের কবলে পড়ে। তখন নেওয়া হয় গণপতদিয়া গ্রামে। গণপতদিয়া গ্রামে যাওয়ার সময় দুটি গ্রুপ হয়, সেই গ্রুপের মধ্যে যুক্তি-তর্ক বিচার-বিশ্লেষণ এমনকি ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া পর্যন্ত হয়েছিল। রাজশাহী বোর্ড থেকে পরিদর্শক এসে দেখেন দুটি গ্রুপের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত চলছে। তখন উনারা সিদ্ধান্ত নিলেন দুইটি স্কুলই অনুমোদন দেওয়া দরকার। উভয় পক্ষের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানের মধ্যস্থতায় একই নামে দুটি স্কুল স্বীকৃতি লাভ করে। তখন একটি গ্রুপ গণপতদিয়া থেকে যায়। গণপতদিয়ার জনাব আসাদ আলী মিয়া, জনাব হাবিবুর রহমান চৌধুরী, জনাব মির্জা আব্দুল গফুর, জনাব ইউনুস আলী খান, জনাব আজগর আলী মোল্লাসহ আরো অনেকে জমি দিয়ে সহযোগিতা করেন। ১৪-১২-১৯৬১ সালে চুক্তি অনুযায়ী স্কুলে সরকারি যে অনুদান আসতো তাহা সমান ভাগে ভাগ করে নেওয়া হত। স্কুলটি চতুর্থবারের মতো সন্ন্যাসীবাধা নামক স্থানে চলে আসে, আরেকটি গ্রুপ ১৯৬১ সালে নাটিয়াবাড়ি চলে আসে। আসার পর নলখোলা বাজারে ঢোল দেয় যে, ধোবাখোলা করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় এখন নাটিয়াবাড়ি। এই স্কুলটি নাটিয়াবাড়িতে নিয়ে আসার জন্য যে তিনজন লোকের বেশি অবদান ছিল তারা হলেন মো. আব্দুর রহমান মিয়া, মো. আমজাদ হোসেন দারোগা মো. আব্দুল সাত্তার মোল্লা। কথিত আছে যে ১৯৭১ সালে এই স্কুলের ৫২ জন ছাত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছাত্র শহীদ নুরুল হোসেন বাঁশিও ছিলেন।

এই ধোবাখোলা করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজটি বিশাল এক মাঠ নিয়ে এখন নাটিয়াবাড়িতে ১২ বিঘা জমির উপর সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে।

লেখক: কবি ও লেখক

ইটোকেইদের ফিজি

শাঁওলি শহীদ

আমার সকল খেলা, সব কাজে,
এ ভূমি জড়িত আছে শাশ্বতের যেন সে লিখন।
হঠাৎ চমক ভাঙে নিশীথে যখন
সপ্তর্ষির চিরন্তন দৃষ্টিতলে,
ধ্যানে দেখি, কালের যাত্রীর দল চলে
যুগে যুগান্তরে।
এই ভূমিখণ্ড'পরে
তারা এল, তারা গেল কত।
তারাও আমারি মতো
এ মাটি নিয়েছে ঘেরি
জেনেছিল, একান্ত এ তাহাদেরি।
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশের কিংবা ভারতবর্ষের এতো সমৃদ্ধ সংস্কৃতি থাকার পরেও আমরা এখনও কেনো এতোটা বিভ্রান্ত- হঠাৎ এই প্রশ্নটা মনে জাগলো যখন ফিজিতে ছিলাম! প্রায় দুই সপ্তাহের ফিজি ট্যুরে প্রতি মুহূর্তে দেখছি ফিজিয়ানরা নিজেদের সংস্কৃতি, আচার, আচরণকে কিভাবে রক্ষা করবার চেষ্টা করছে। ফিজি সম্পর্কে খুব জানা ছিলো না! এবারের ভ্রমণটা একটু ভিন্ন, কারণ দুই দেশের আদিবাসীদের মিলনমেলা ছিলো এটি। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ছাত্রীদের নিয়ে এসেছিলাম এঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবার জন্য। ইতিহাস থেকে শুরু করে অর্থনীতি, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, অবস্থা, সংস্কৃতি সম্পর্কে একরকম হাতেখড়ি হলো বলা যায়। এই প্রথম কোনো জায়গা থেকে ফেরার সময় মনে হলো থেকে যাওয়া যেতো যদি! যা হোক, সে বিষয়ে পরে লিখবো ক্ষণ!

ফিজিয়ান আদিবাসীদের ব্যবহার দেখলে অবাক হতে হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা এঁরা এতোটা নম্র, ভদ্র, মাটির মানুষ! অদ্ভুতভাবে যখন যা প্রশ্ন মনে এসেছে অকপটে উত্তর করেছেন। যখন যাঁর সাথে কথা বলেছি আমরা। খুব অবাক হলাম জেনে যে এরকম মানুষগুলোর পূর্বপুরুষেরা নৃশংস ছিলো। ক্যানিব্যালিজম এর অভ্যেস ছিলো ওদের। তার চাইতেও অবাক হলাম দেখে যে এ সম্পর্কে এঁরা কথা বললেন নিঃসংকোচে। বঙ্গদেশীয় আমরা তো এতোটাই কূপমন্ডূক, মূর্খ যে অতীতের ভুল ঢাকতে ঢাকতে আমরা অতীতকেই অস্বীকার করে ফেলি, অতীত বা ইতিহাস থেকে শেখা তো দূরের কথা। শিখতে গেলে প্রথম যে শর্ত তা হলো আত্ম-প্রতিফলন বা self-reflection অথবা self-actualisation যাকে বলা হয় highest form of knowledge. তো ফিজিয়ানরা সেই কাজটি করেছিলেন যখন ব্রিটিশরা এখানে ঘাঁটি গড়তে এসেছিলো।

অস্ট্রেলিয়াতে থাকতে থাকতে ঔপনিবেশিকতা সম্পর্কে এমন একটা নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠেছে ভেতরে ভেতরে বুঝতে পারলাম (ভাববেন না যে তার খুব একটা ব্যত্যয় ঘটেছে। কারণ ঔপনিবেশিকতার রকমফের ঘটেছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে। ঔপনিবেশিকদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী এবং আরও নানাবিধ কারণের সংমিশ্রণে। আর আজ যে আমরা পরোক্ষভাবে ঔপবিবেশিকতার শিকার হচ্ছি তা সম্পর্কেই বা আমরা কতজন ওয়াকিবহাল)। আজকের লেখা ফিজি নিয়ে। যখন ফিজিয়ানরা ব্রিটিশদের ধন্যবাদ দিল তাদের দেশের অবস্থার জন্য। প্রথমদিন নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারিনি। মনে একগাদা

প্রশ্ন নিয়ে বাড়ি ফিরে চিন্তার ঘোর কাটে না! পরের দিন সাহস করে জিজ্ঞেস করাতে বেরিয়ে গেলো যে সত্যিই ঔপনিবেশিকতা ফিজিয়ানদের জীবনে নিয়ে এসেছে বিপুল পরিমাণ ইতিবাচক পরিবর্তন। কিন্তু যারা পড়ছেন ভেবে বসবেন না ব্রিটিশরা যেচে এসে এঁদের উপকার করেছে।

ফিজিয়ানরা নিজেদের অতীতের কথা ভেবে, নিজেদেরকে শোধরাবার জন্য ব্রিটিশদের কাছে প্রথমেই আত্মসমর্পণ করেছিল। তাঁরা ব্রিটিশদের অতিথি হিসেবে দেখেছিলো এবং সাদরে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের সাথে এমন এক মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে এসেছিল (এখানে তাঁদের দূরদর্শিতা দেখে আমি অবাক হয়েছি) যেনো ভবিষ্যতে তাঁরা নিজেদের ঐতিহ্যও অটুট রাখতে পারে আবার ব্রিটিশদেরও মন রক্ষা হয়। তাই ব্রিটিশদের এঁরা এদেশ শাসন করতে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু তারা নিজেরা তাঁদের সংস্কৃতির ওপরে ও ভূমির ওপরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারাতে দেয়নি। তার সবচাইতে বড় উদাহরণ হলো ফিজিয়ানদের land management system. ফিজির ৯১ শতাংশ ভূমি ইটোকেইদের ভূমি। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় ফিজিয়ানরা কেউ জমির মালিক নয় কিন্তু সবার জমি রয়েছে। ভাবতে পারেন বাংলাদেশে যেখানে কিছু মানুষের জমি, বাড়ি-ঘর, সম্পত্তির হিসেব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে আদিবাসী ফিজিয়ানদের নিজেদের জমি নেই। কারণটা পরে লিখছি।

যাহোক, যা বলছিলাম- ফিজিয়ানরা ১৯৪০ সালে জমি বণ্টন ব্যবস্থা স্থাপন করে। “iTaukei Land Trust Act and Agricultural Landlord & Tenant Act. যেখানে বলা হয়, “iTaukei land cannot be sold. কারণ তা তাদের মূল্যবোধের বিরোধী। ফিজিয়ানরা জমির ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশ্বাসী নয়। অস্ট্রেলিয়াতেও Aboriginal দের ভেতরে private ownership of land বলে কিছু ছিলো না। এগুলো পশ্চিমাদের পরম অবদান। বড় বড় দেশের বড় বড় জ্ঞান-গরিমা। বরং আদিবাসীদের জীবনের প্রধান ভিত্তি হলো সম্পর্ক, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সমতা, নিজেদের ভেতরে এবং প্রকৃতির সাথে আদান-প্রদানের মাধ্যমে বেঁচে থাকা। ভূমি বা ল্যান্ড আদিবাসীদের জীবনে পবিত্র বন্ধন। ভূমির সাথেই তাঁদের আত্মার সম্পর্ক। ভূমি তাঁদের ভাষা বোঝে, তাঁদের কথা শোনে, তাঁদের পথ দেখায়। আমাদের

ফিজিয়ানরা নিজেদের সংস্কৃতি, সভ্যতাকে পশ্চিমা ছোবলমুক্ত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। দেখলে সমীহ জাগে। এখানে গ্রাম প্রচুর। এখনও গ্রামের মোড়ল ব্যবস্থা (যাঁকে ওরা বলে চিফ) প্রচলিত কিন্তু ফিজিয়ানরা প্রতিনিয়ত এর আধুনিকায়ন করার চেষ্টা করে চলেছেন। সেখানে গ্রামে এখনও barter system এর প্রচলন রয়েছে। কেউ যেনো অভুক্ত না থাকে। ফিজিয়ান আদিবাসী অধ্যুষিত কয়েকটা স্কুলে গেলাম। boarding স্কুল। খাবার দাবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ তারা। তাঁরা সেখানে নিজেদের মাটির উপযুক্ত ফসল, ফলফলান্তি নিজেরাই উৎপাদন করছে। ছাত্রদেরকে কৃষিকাজে হাত লাগাতে উৎসাহ দিচ্ছে। এতে তাঁদের হাত ক্ষয়ে যাচ্ছে না বরং মস্তিষ্ক হচ্ছে উর্বর। কীভাবে পরে লিখবো।

দেশও তো আমাদের কাছে তাই, না? দেশমাতৃকাকে আমরা পুজো করি। করতাম বলাই বোধহয় ঠিক হবে। তাইতো পৃথিবীর যে প্রান্তেই আমরা বসবাস করি না কেনো আজও বাংলা শুনলে আমাদের মন হয় উচাটন। বাঙালির জয়যাত্রা দেখলে আশায় মন বাঁধে। কিন্তু সে কোন বাংলা? এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো না। আপনাদেরকে ভাবতে বলবো।

ইটোকেইদের মূলনীতির ওপরে ভর করে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ভূমিকে ব্যক্তিমালিকানাধীন করা চলবে না। ইটোকেইরা ৯৯ বছরের জন্য ল্যান্ড ট্রাস্টের কাছ থেকে জমি ধার করেন, তারপর কেউ সেখানে বাড়ি বানান কিংবা ব্যবসা বাণিজ্য করেন। ল্যান্ড ট্রাস্টকে তাঁরা ভাড়া দেন। ল্যান্ড ট্রাস্ট কিন্তু এগুলো নিজেদের পকেটে পুরে ফেলেন না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এর কিছু অংশ তাঁরা জমা

করেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা যখন ১৮ বছর বয়সী হয় তখন এই অর্থটা তাঁরা তাঁদেরকে দেন যেনো নতুন প্রজন্ম তাঁদের ভবিষ্যৎ গড়ে নিতে পারে।

এখন আবার ফিরে যাই অতীতে। উপনিবেশের শুরুতে ব্রিটিশরা কীভাবে কেনো মেনে নিয়েছিলো এঁদের এই ব্যবস্থা। তারা তো দ্বীপদখলের উন্মত্ততায়ই ফিজিতে এসেছিলো। তাহলে ইটোকেইরা কী করে তাদের সাথে বোঝাপড়ায় এলো? সেখানেও ইটোকেইদের দূরদর্শিতাই বলবো আমি এবং আত্মসচেতনতা।

আগেই বলেছি ইটোকেইরা খুব অতিথিপরায়ণ। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে তাঁদের জমির এক ক্ষুদ্র অংশ তারা ব্রিটিশসহ অন্যান্য অতিথিদের দিয়ে দেবে। বিনিময়ে তাঁরা নিজেদের সংস্কৃতির আদলে দেশ গড়ে তুলবে। তারপর Ratu Sir Lala Sukuna কে পাঠিয়ে দিয়েছিলো Oxford University তে পড়তে কিন্তু উনি পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে এসেও এমনভাবে ফিজির জমিব্যবস্থাকে সংস্কার করেছিলেন যে এতে ফিজিয়ানদের শাপেবর ই হয়েছে। এখনও ফিজিতে তিন ধরনের জমি আছে:

১. ইটোকেই ল্যান্ড- ৯১%
২. ফ্রীহোল্ড ল্যান্ড - ৭% এবং
৩. রাষ্ট্রীয় ল্যান্ড - ২%

আপনাদের যদি উন্নতির মাপকাঠি হয় GDP, কিংবা বাড়ি, গাড়ি, চাকরী, বেতন তাহলে মনে হবে এঁরা হতদরিদ্র, কিন্তু তারা নিজেদের সুখী দাবি করছে। তাঁরা মিতভাষী, হামবরামী নাই কারও মধ্যে। গ্রামের মানুষগুলো মাটির সাদাসিধা মানুষ কিন্তু তাঁদের আদর আপ্যায়নের সীমা নেই।

আমরা একটা বোট ট্যুরে গিয়েছিলাম। এই প্রকল্পটার নাম হলো Uto Ni Yalo. এর অর্থ হলো Heart of the Spirit এই প্রকল্পের আওতায় ফিজিয়ান তাঁদের ঐতিহ্যবাহী যে প্র্যাক্টিস ছিলো যা ওদের ভূমির উপযুক্ত এবং ঐতিহ্য বহন করে তাকে ওরা আধুনিকায়ন করার চেষ্টা করছে। ২০১০ সালে ওরা একটি বজরার মতো বড় নৌকা বানায়। ওই প্রজেক্টের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো দেখলে বোঝা যায় যে সেগুলো কতোটা নিজেদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতিকে ভর করে গড়ে ওঠা। সেগুলো হলো:

- love for their ocean
- wisdom of our traditional knowledge
- collaboration
- their wellbeing

এই নৌকাতে আধুনিক দিক নির্ধারক কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় নি। দিকনির্দেশনা হয় wayfinding করে (which is the art of navigation using the natural elements, such as, stars, sea swell, currents and waves cloud formations, bird lif) এগুলো দিয়ে। সাথে সাথে এঁরা canoe building এরও প্রজেক্ট করছে যেনো তরুণ প্রজন্মের ভেতরে এই জ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটে এবং সাথে সাথে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ তৈরী হয়।

Turtles বা কচ্ছপ হলো ওঁদের লোগো। কারণ Turtles are the best navigator in the animal kingdom. Female turtles can come back home to lay their eggs from anywhere in the globe.

এই নৌকা নিয়ে এঁরা একমাসের ওপরে ট্যুরও করে এসেছে। ফিজি থেকে আমেরিকাও ঘুরে এসেছে।

এভাবেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ফিজিয়ানরা নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, তাঁদের নিজেদের মাটির সাথে সম্পৃক্ত করে পুনরুত্থান করায় সচেষ্ট। বাঙালি কিছু শিখুন নিজেকে একটু জানবার চেষ্টা করুন।

লেখক: অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, কার্টিন ইউনিভার্সিটি, পার্থ, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া

বায়োগ্যাস স্থাপন ও উদ্যোক্তা তৈরি

শান্ত কুমার দাস

জৈব পদার্থগুলো পচনের ফলে যে বিভিন্ন গ্যাস পাওয়া যায় তার একটি মিশ্রিত রূপ হচ্ছে বায়োগ্যাস এবং সাধারণভাবে কৃষি বর্জ্য, জৈব সার, পৌর বর্জ্য, উদ্ভিদ সৃষ্ট উপকরণ, নর্দমার বর্জ্য, সবুজ বর্জ্য বা খাদ্য বর্জ্য ইত্যাদি কাঁচামাল হতে বায়োগ্যাস উৎপন্ন হয়। বায়োগ্যাস প্লান্ট হতে শুধু যে রান্নার জন্য গ্যাস পাওয়া যায় তাই নয়, এ থেকে শস্য ও মাছের পুকুরের জন্য জৈব সারও মেলে। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রথম বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশে বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণের জন্য কিছু সক্রিয় কর্মসূচী ও প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে পোলট্রি বর্জ্য ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্টগুলোই সর্বাপেক্ষা সফল হয়েছে। এগুলো থেকে প্রাপ্ত গ্যাস দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় এবং এভাবে প্রাপ্ত গ্যাস দিয়ে সর্বাধিক প্রায় অর্ধ মেগাওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে ৩১.০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বায়োগ্যাস/বায়োমাস থেকে উৎপাদনে স্রেডা'র উদ্যোগে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে বায়োমাস/বায়োগ্যাস, ডেইরি ও পোলট্রি বর্জ্য, মিউনিসিপালিটি বর্জ্য, কসাইখানার বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। যেহেতু সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ২০২০ সালের পর কোন গৃহস্থালীতে নতুনভাবে প্রাকৃতিক গ্যাস সংযোগ থাকবেনা সেহেতু বায়োগ্যাস ব্যবহার করে রান্না বা গৃহস্থালীর অন্যান্য ব্যবহার আর্থিকভাবে সম্ভাবনাময়।

গৃহস্থালী রান্নাবান্না এবং ম্যান্টেল বাতি জ্বালানো ছাড়াও বায়োগ্যাস দিয়ে জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বাতি, ফ্যান, ফ্রিজ, টিভিসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি চালানো সম্ভব। গবেষকরা বলছেন ৭-৮ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য ৫-৬টি মাঝারি আকারের গরুর দৈনন্দিন গোবর থেকে ১০৫ ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন সম্ভব যা দিয়ে তিন বেলার রান্না-বান্নাসহ একটি ম্যান্টেল বাতি জ্বালানো যাবে।

বায়োগ্যাস প্রকল্প ভাবনা

বায়োগ্যাস একদিকে যেমন লাভজনক অন্যদিকে এলাকার মধ্যে উদ্যোক্তা তৈরি করতে সহায়ক হবে। তাই বায়োগ্যাসকে একটি প্রকল্প হিসেবে নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে। যুগ-যুগ ধরে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে রান্না বান্নার কাজে কাঠ, খড়-কুটা, নাড়া, শুকনা গোবর এগুলোই জ্বালানি

হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। বর্তমানে প্রতিবছর দেশে ৩ কোটি ৯০ লাখ মেট্রিক টন এ জাতীয় জ্বালানির প্রয়োজন। জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহারের ফলে গাছপালা উজাড় হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে আমরা শুধু বনজ সম্পদই হারাচ্ছি না, আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে ঠেলে দিচ্ছি এক ভয়াবহ অবস্থার দিকে। এইগুলি দিয়ে রান্না করার ফলে এক দিকে যেমন বায়ু দূষিত হচ্ছে অন্য দিকে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে। অপরদিকে গোবর, নাড়া এবং অন্যান্য পচনশীল পদার্থগুলো পুড়িয়ে ফেলার ফলে আবাদি জমি জৈব সার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জ্বালানি সঙ্কট তীব্রতর হচ্ছে। এই জ্বালানি সঙ্কট মোকাবেলায় ও বায়ু দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিকল্প জ্বালানি হিসেবে বায়োগ্যাসই একমাত্র এই সমস্যার সমাধান দিতে পারে এবং নিশ্চিত করতে পারে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, উন্নত মানের জৈবসার, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও উন্নত জীবন যাত্রা।

বর্তমানে বাংলাদেশে গরু-মহিষের সংখ্যা আনুমানিক ২ কোটি ২০ লাখ। এই গরু-মহিষ থেকে দৈনিক প্রাপ্ত গোবরের পরিমাণ ২২০ মিলিয়ন কেজি। প্রতি কেজি গোবর থেকে ১.৩ ঘনফুট গ্যাস হিসাবে বছরে ১০৯ ঘনমিটার গ্যাস পাওয়া সম্ভব যা ১০৬ টন কেরোসিন বা কয়লার সমান। এ ছাড়াও হাঁস-মুরগি, ছাগল-ভেড়া ইত্যাদির মলমূত্র থেকে এবং আবর্জনা, কচুরিপানা বা জলজ উদ্ভিদ থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বায়োগ্যাস পাওয়া সম্ভব। শুধু তাই নয় গ্যাস হিসাবে ব্যবহারের পর ঐ গোবর জমির জন্য উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব। তাই প্রতিটি পরিবারকে বায়োগ্যাস প্লান্টের সাথে যুক্ত করতে পারলে জ্বালানি সঙ্কট দূর করে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং উন্নত গ্রামীণ জীবনযাত্রা নিশ্চিত করা সম্ভব।

বর্তমানে বাংলাদেশে গরুর খামার ও পোল্ট্রি খামারের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে গরুর খামার এখন প্রায় প্রতিটি গ্রামে ২/১টি করে আছে। গরুর খামারের মধ্যে দুই রকম খামার করা হয়ে থাকে। একটি হল গাভী পালন খামার এবং অন্যটি হল গরু মোটাতাজাকরণ খামার। এই খামারীরা শুধু বাণিজ্যিকভাবে খামার করে থাকে। যারা দুধ বিক্রির জন্য গাভী পালন করে থাকে তাদের মধ্যে কেউ কেউ ৪/৫ টি গাভী কিনে নিজেরাই লালন পালন করে থাকেন, আবার কেউ কেউ ব্যবসা হিসেবে শেড তৈরি করে গাভী পালন ও ক্রয়-বিক্রয় করে থাকেন। তাদের শেডে সবসময় ছোট বড় মিলিয়ে ১৫-২০টি গাভী থাকে। এই খামারীরা অনেকেই জানেন না শুধু দুধ বিক্রি করা এবং গরু মোটাতাজা করেই টাকা উপার্জন ছাড়াও বায়োগ্যাস করা এবং এর বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদন করে বাড়তি উপার্জন করে জীবন-মান উন্নত করাও সম্ভব। ৪-৫টি গরু পালন করলেই একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট করা যায়। বায়োগ্যাসের সাহায্যে শুধু রান্না বান্নার কাজই হয়না, বর্তমান প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে উন্নত জীবন ঝাপনের সকল ব্যবস্থাই করা সম্ভব।

বায়োগ্যাস প্রকল্পে সুবিধা ও অসুবিধা

- সুবিধাসমূহ

বায়োগ্যাস প্লান্ট করার ফলে নিজের রান্না-বান্নার কাজ করেও আশে পাশের আরো কয়েকটি বাড়িতে সংযোগের মাধ্যমে গ্যাস দেয়া যায়। এর ফলে একটি বাড়তি ইনকাম সোর্স তৈরি হয়। বায়োগ্যাস উৎপাদনের পর যে বর্জ্য থাকে সেই বর্জ্য দিয়ে জৈব সার ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। নিজের জমি না থাকলে বা জমিতে ব্যবহার করার পর যে উদ্বৃত্ত বর্জ্য থাকবে তা অন্যের কাছে বিক্রি করে টাকা আয় করা সম্ভব।

গৃহস্থালি রান্নাবান্না এবং ম্যান্টেল বাতি জ্বালানো ছাড়াও বায়োগ্যাস দিয়ে জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বাতি, ফ্যান, ফ্রিজ, টিভিসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি চালানো সম্ভব। গবেষকরা বলছেন ৭-৮ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য ৫-৬টি মাঝারি আকারের গরুর দৈনন্দিন গোবর থেকে ১০৫ ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন সম্ভব যা দিয়ে তিন বেলার রান্না-বান্নাসহ একটি ম্যান্টেল বাতি জ্বালানো যাবে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে ও শহরতলিতে বায়োগ্যাস প্লান্ট করা হলে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ অনেক কমে আসবে। শুধু তাই নয় এই বায়োগ্যাস প্লান্ট করার ফলে গাছপালা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের উপর চাপ কমবে এবং এলএনজি গ্যাস আমদানিও কমে আসবে।

- অসুবিধা সমূহ

প্রতিদিন খামারের বর্জ্য প্লান্টে দিতে হয় এবং তা ভালভাবে মিশাতে হয়। কোন কারণে বৈদ্যুতিক মোটরে সমস্যা দেখা দিলে গ্যাস উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। ফলে রান্না-বান্না ও অন্যান্য কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

বর্তমান বিশ্বে শিল্পায়নের ফলে বায়ুমণ্ডলে অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্ব নানা ধরণের প্রতিলকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে। কার্বন কমানোর জন্য রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে বায়োগ্যাস ব্যবহার একটি পদক্ষেপ। গ্রামাঞ্চলে রান্না-বান্নার কাজে জ্বালানী হিসাবে বিভিন্ন জীবাশ্ম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই জীবাশ্ম ব্যবহারের সময় যে ধোয়া নির্গত হয় তা থেকে কার্বনের সৃষ্টি হয়। কার্বন বায়ু মণ্ডলে গিয়ে উষ্ণতা সৃষ্টি করার ফলে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। বিশ্বের এই পরিস্থিতিতে বায়ুগ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

লেখক: এজিএম, সিদীপ

অরুণা, কেউ কি থাকতে আসে

মুহাম্মদ সামাদ

অরুণা, বলতো এত জটিলতা কেনো
আমি তো যাবোই–যাবারও ছন্দ থাকে
ভেঙে ভেঙে যেতে চাই।

ধানখেতে বাতাসের নাচ দেখে
নদীতে সমুদ্রে ঢেউয়ের দোলা দেখে
হরিণের মতো কচিঘাস লতাপাতা গায়ে মেখে
প্রিয়কন্যা নন্দিতার কপালে একটা চুমু রেখে
হলুদ সর্ষের খেতে পায়েচলা মেঠোপথে
দুঃখ-দহন আকাশে উড়িয়ে জ্যোৎস্নায় পুড়িয়ে
তুমুল বৃষ্টিতে ভিজে একদিন চলে যাবো।

আমি তো যুদ্ধের ঘোড়া নই–ত্বরিত গতিতে কেনো যাবো
খুনিদের তাড়া থাকে–তাদের রক্তের ক্ষুধা
তারা আগুনে পোড়ায় গ্রন্থরাজি মেধা ও সভ্যতা
তারা ভাঙে হেরা পর্বতের গুহা চিত্রশালা বুদ্ধমূর্তি
বেথেলহেমের নেটিবিটি চার্চ...

আমি ভালোবাসি সবুজ অরণ্যে গজেন্দ্রগমন কিংবা
পাখিদের মতো ডালে ডালে কথা বলে চলে যেতে চাই।

আমার এমন কোনো তাড়া নেই
আমি তো জানিই–প্রাসাদ অট্টালিকা সব ভস্ম হয়
'নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়'...
তাই, ঘুরে ঘুরে প্রতিদিন ভোরে
তোমার দ্বিধার কাছে ফিরে আসা আমার স্বভাব নয়
অরুণা, তুমিই বলো–কেউ কি থাকতে আসে, বলো...

আগানে বাগানে

শওকত হোসেন

সারারাত জঙ্গলে বৃষ্টি হলে গাছ ভিজে যায়–

ভিজতে থাকে একাধারে বড়গুলো আগে
তারপর মাঝারি
তারপর ছোট–

গুল্মলতা ভেজে–
মাটি ভেজে, বীজ ভেজে–
রাতভর টানা বৃষ্টি হলে বনে
কার কথা কে শোনে!

পারফিউম

সিদ্দিক প্রামাণিক

যে-কোনো সময় রিক্সায় উঠতে ভালো লাগে খুব,
পৃথিবীর
সবচে' আরামদায়ক বাহন বলে মনে হয়।
ট্রেনও প্রিয়।
জরুরি প্রয়োজন হলেও
বাসে চড়তে পারি না আমি,
উঠলেই বমি আসে
মাথা ঘুরতে থাকে পৃথিবীর মতোই
তবে তোমাকে যখন
লক্কর-ঝক্কর বাসে চড়ে
দুপুরের নির্জনতা ভেঙে
স্টপেজে নামতে দেখি,
আবার
উড়তে উড়তে যেতেও দেখি
গন্তব্যের দিকে-
তখন কী যে ভালো লাগে আমার
রঙচটা বাস
তার দূষিতপ্রবণ কালো ধোঁয়া,
এই প্রথম ধোঁয়াকে মনে হয় ফ্রান্সের
পারফিউম–
ঠিক যেনো উড়ন্ত–
ছুটে আসছে তোমার গা থেকে

সিদীপের সকল উঠানস্কুলে ‘বিশ্ব শিক্ষক দিবস-২০২৪’ উদযাপন

৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস। এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল: Valuing teacher voices: Towards a new social contract for education। অর্থাৎ শিক্ষাকে কেন্দ্র করে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের জন্য শিক্ষকের কথা ও মতকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির অধীন আড়াইহাজারের বেশি শিক্ষাকেন্দ্রে দিবসটি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়:

১. বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সকল শিক্ষিকা ও শিক্ষাসুপারভাইজারকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে নির্বাহী পরিচালক একটি চিঠি পাঠান যা ১৩৯টি ব্রাঞ্চে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে প্রত্যেক রিফ্রেশারে পড়ে শোনানো হয়।

২. প্রত্যেক শিক্ষিকা তার শিক্ষাকেন্দ্রে ২০ জন/উপস্থিত ছাত্রছাত্রীকে (প্রাক-প্রাথমিক, ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণি) সংক্ষেপে বিশ্ব শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

৩. ৩ অক্টোবর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যেকোনো একদিন প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষিকাকে কেন্দ্র করে ২০ জন শিক্ষার্থী গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সমকণ্ঠে “শিক্ষক তুমি সবার সেরা/ তুমি মা-বাবার সমান” বলে প্রিয় শিক্ষিকাকে সম্মান জানায়।

৪. শিক্ষাকেন্দ্রগুলোয় কোথাও ফুল দিয়ে, ছবি এঁকে, কেক কেটে, গান করে ইত্যাদি নানাভাবে শিক্ষার্থী, শিক্ষিকা ও শিক্ষাসুপারভাইজার মিলে দিবসটি পালন করে।

প্রণয়ের কথায়

আবুল কালাম তালুকদার

দিগন্তের খুব কাছের মেঘগুলি নিমিষেই
রংধনুর সাত রঙে হারায়
শূন্যের উপরে আসে পূর্ণতা
অনাচারের দিন শেষে রাজপথে
আসে পূর্ণ স্বাধীনতা
কঠিন সময়েও আসে সুখের অনুভব
বিসর্জনে আসে প্রাপ্তির সুখ
ভোরের শিশিরে আসে আনন্দ দিন
অন্ধকারেও জ্বলে আলোর প্রদীপ শিখা
হারিয়ে যাওয়া গল্পে আসে পরিপূর্ণ সুখ
অমাবস্যায় রাতে থাকে না অন্ধকার
দূরের মেঘের মতো কাছে আসে প্রেম
ভিজে যায় দেহ ও মন।

৯ নভেম্বর ২০২৪ শনিবার সিলেটে একটি অভিজাত হোটেলে কবি আবুল কালাম তালুকদারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কবিতাবলি’র প্রকাশনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

কবি আবুল কালাম তালুকদার সিদীপের হাজীগঞ্জ এরিয়ার সাচার শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

‘মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার’ নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গবেষণাপত্র উপস্থাপন

১৪ নভেম্বর ২০২৪, সমাজকর্ম বিষয়ক WSWD2024 7th International Conference on EMPOWERING COMMUNITIES: THE ROLE OF SOCIAL WORK FOR SUSTAINABLE FUTURE শীর্ষক সম্মেলনটি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সিদীপ পরিচালিত ‘মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার’ নিয়ে এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে Seeds of Knowledge—How "Mukto-Pathagar" is about to create a culture of reading in Bangladesh: A study in Chargas শীর্ষক একটি গবেষণা উপস্থাপন করেন প্রধান কার্যালয়ের মাইক্রোফিন্যান্স-এর জুনিয়র কর্মকর্তা জনাব মাহবুবুর রশীদ অরিস।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কুটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সিদীপের মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব মো. আনোয়ার হোসেন, অন্যান্য শিক্ষক, সিদীপ কুটির বিএম মজিবুল হক মোল্লা, কৈশোর কর্মসূচির সোহাগ রায়, শিক্ষা সুপারভাইজার সামান্তা দুলাল, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (SACMO) হানিফ শের ও অন্যান্য। সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে উপস্থিত ছিলেন গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান। এছাড়াও একই দিনে কুটি অটল বিহারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সিদীপের মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হয়।

কবিতা

হুমায়ুন কবির

কবিতা আমার শরৎ আকাশ
নীলের আভায় ভাসে,
কবিতা আমার ঝাউপাতা দোলে
শুভ্র সাদায় হাসে।
কবিতা আমার তিতাসের জল
বর্ষার দিনের বেলা,
কবিতা আমার কলাগাছে গড়া
ছোট্ট বেলার ভেলা।
কবিতা আমার তিতাসের তীরে
সবুজবীথির ঢালী,
কবিতা আমার দেশমাতৃকার
রক্তে সিক্ত বালি।
কবিতা আমার চব্বিশ সাল
বিদ্রোহী যুবার হাঁক,
কবিতা হলো একাত্তরের
সংগ্রামের ঐ ডাক।
কবিতা আমার মুগ্ধের পানি
আবু সাঈদের প্রাণ,
কবিতা আমার ভাই হারানোর
বিষাদ সুরের গান।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে
সেরা পাঠক-পাঠিকার পুরস্কার বিতরণ

বিভিন্ন জেলায় যেসব স্কুল-কলেজে সিদীপের পরিচালিত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের কার্যক্রম চলমান সেগুলোয় সেরা পাঠক-পাঠিকা পুরস্কার অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠান হয় নিম্নলিখিত তারিখে ও বিদ্যালয়গুলোতে:

৮ সেপ্টেম্বর পাবনার দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে, ১৭ সেপ্টেম্বর পাবনার কাশিনাথপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে, ২৩ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জে বন্দর উপজেলার হাজী আব্দুল মালেক উচ্চ বিদ্যালয়ে, ২৬ সেপ্টেম্বর কুমিল্লার রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে, ২৮ সেপ্টেম্বর রাজশাহীর বাঘায় আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে, ৬ অক্টোবর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে, ৮ অক্টোবর চট্টগ্রামে চিনকী আস্তানা উচ্চ বিদ্যালয়ে, ৪ নভেম্বর পাবনার ভাঙ্গুরা ইউনিয়ন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজে, ৭ নভেম্বর পাবনার চাটমোহরে বোয়াইলমারি উচ্চ বিদ্যালয়ে, ১২ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চারগাছ এন আই ভূঁইয়া উচ্চবিদ্যালয়ে, ১৩ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে রোকন উদ্দিন মোল্লা বালিকা বিদ্যালয়ে, ১৪ নভেম্বর রাজশাহীর পুঠিয়ায় ভাটপাড়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে, ১৮ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রাবেয়া মান্নান ভূঁইয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে, ২০ নভেম্বর সাভারের আশুলিয়ায় দোসাইদ অধন্য কুমার স্কুল এন্ড কলেজে, ২০ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জের মদনগঞ্জ সালাউদ্দিন কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড হাই স্কুলে ও ২৪ নভেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাটে নেকজান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সেরা পাঠক-পাঠিকার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এসব অনুষ্ঠানে স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিদীপের সংশ্লিষ্ট শিক্ষাসুপারভাইজার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ব্রাঞ্চের অন্যান্য কর্মী ও ঢাকাস্থ সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের কর্মকর্তাগণ।

"আলোর যাত্রী হই"
ডকুমেন্টারির প্রদর্শনী এবং শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তি কর্মশালা

৬ নভেম্বর ২০২৪এ সিদীপের দেবোত্তর শাখায় মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্যোগে দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মুক্তপাঠাগার নিয়ে নির্মিত ডকুমেন্টারি "আলোর যাত্রী হই" প্রদর্শিত হয়। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহবুব উল আলম।

তাল ও শজনে চাষ সম্প্রসারণ বিষয়ক অনলাইন মিটিং

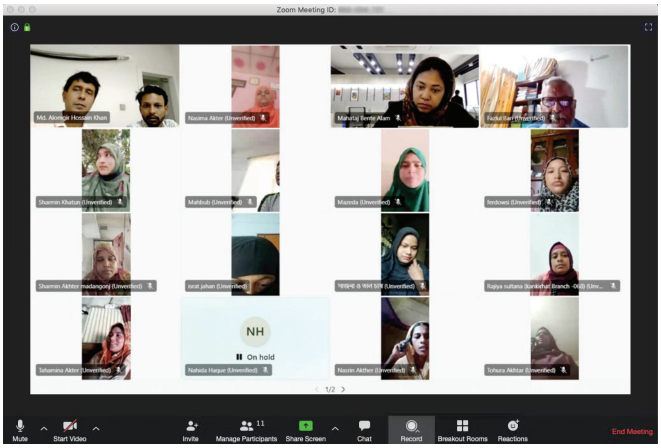

২৯ অক্টোবরে তাল ও শজনে চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত সুপারভাইজারদের নিয়ে অনলাইন মিটিং পরিচালনা করা হয়। যেখানে সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারি, নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাবেগর জনাব আলমগীর হোসেন খান এবং ৩২ জন শিক্ষা সুপারভাইজার যুক্ত হয়েছিলেন। নির্বাহী পরিচালক মহোদয় এই কার্যক্রমে আন্তরিক অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষা সুপারভাইজারদের সাধুবাদ জানান। মিটিংয়ে শিক্ষা সুপারভাইজারগণ মাঠপর্যায়ের কাজের অভিজ্ঞতা ও সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। মাসিক প্রতিবেদন ফরমেট নিয়ে কারো কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা তাও শোনা হয়। আলোচনা থেকে জানা যায় কিছু কিছু এলাকায় শজনে গাছ অপ্রতুল, আবার কিছু এলাকায় তার বহুল চাষ আছে। যার প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান মহোদয় পরামর্শ দেন, যে এলাকায় পর্যাপ্ত শজনে গাছ পাওয়া যায় সে এলাকা থেকে শজনে ডাল সংগ্রহ করে যে এলাকায় অপর্যাপ্ত আছে সে এলাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা যায় কিনা! শিক্ষা সুপারভাইজাররা তাল ও শজনের পাশাপাশি অন্য কোন গাছ রোপণের ব্যাপারেও আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এছাড়াও শিসক স্কুলের বাইরেও স্থানীয় স্কুলগুলোতে সচেতনতা সৃষ্টি করার ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

ইয়ুথ ভলান্টিয়ার ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রাম

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) ও কনসার্নড উইমেন ফর ফ্যামিলি ডেভেলেপমেন্টের (সিডব্লিউএফডি) সহযোগিতায় গত ০৯ থেকে ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত Eastern Flood Response প্রকল্পের আওতায় ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া, ফুলগাজী ও দাগনভূঞা উপজেলায় মোট ৮২ জন ভলান্টিয়ারকে নিয়ে ২ দিন ব্যাপী ইয়ুথ ভলান্টিয়ার ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। বন্যা পরবর্তী কিশোরীদের মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে সচেতনতা, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধী কিশোরীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ভলান্টিয়ারগণের ভূমিকা, দায়িত্ব-কর্তব্য, উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং কিট ডিস্ট্রিবিউশন প্রক্রিয়া ও করণীয় নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ইয়ুথ ভলান্টিয়ার ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রামে সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) ও কনসার্নড উইমেন ফর ফ্যামিলি ডেভেলেপমেন্টের (সিডব্লিউএফডি) কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সিদীপের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

লাবণ্য আক্তারের সফলতা

কিশোর কুমার

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলার বড় কুমিড়া ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামের হতদরিদ্র পরিবারের গৃহবধু লাবণ্য আক্তার, স্বামী মো. ফারুক মিয়া। অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে কাটতো তাদের জীবন। যদিও ২ বিঘা জমি আছে, কিন্তু টাকা না থাকায় জমিতে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। তাই স্বামী প্রায় সারা বছর অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি করেন এবং অল্প কিছুদিন নিজের জমিতে কাজ করেন। তবে সবসময় কাজ না থাকায় সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে।

১ মেয়ে ও ১ ছেলে নিয়ে লাবণ্য আক্তারের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন। ছেলেকে টাকার অভাবে লেখাপড়া করাতে পারেননি মেয়েকে স্কুলে লেখাপড়া করাচ্ছেন। দারিদ্র্যের কারণে স্বামী-স্ত্রী ২ জনেই দিনরাত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেন, তবুও সংসারের অভাব দূর হয় না।

পাড়া-প্রতিবেশীর কাছ থেকে লাবন্য আক্তার জানতে পারেন যে, সিদীপ নামে একটি সংস্থা আছে এবং সংস্থাটি দরিদ্র প্ররিবারের লোকদের বিভিন্ন ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে যার কিস্তি প্রতি মাসে বা সপ্তাহে পরিশোধ করতে হয়। এছাড়া আরও এক ধরনের ঋণ দেয়া হয় যার কিস্তি ৬ মাস মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পরিশোধ করতে হয়। এককালীন পরিশোধের এ বিষয়টি তার খুব ভাল লাগে এবং এ ঋণ নেওয়ার আগ্রহ জাগে। যেহেতু মাসিক বা সাপ্তাহিক কোন কিস্তি নেই, তাই ঋণ নিয়ে কোন কাজ করে এককালীন ঋণ প্ররিশোধ করা সম্ভব। বিষয়টি নিয়ে লাবন্য আক্তার তার স্বামীর সাথে আলোচনা করেন। ঋণের টাকা দিয়ে তাদের নিজের জমিতে এবং আরও কিছু জমি বন্ধক নিয়ে সেই জমিতে বিভিন্ন সবজি চাষ করে লাভের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করেও লাভবান হওয়া সম্ভব বলে লাবন্য আক্তার তার স্বামীকে জানান। স্ত্রীর চিন্তাভাবনা বাস্তবসম্মত বলে স্বামী তার স্ত্রীর কথায় সম্মত হন এবং সিদীপ থেকে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং ঋণ গ্রহণ করেন।

এস.এম.এ.পি ঋণ নেয়ার সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে তাকে ট্রেনিং করানো হয়। সেই ট্রেনিং পেয়ে লাবণ্য আক্তার অনেক উপকৃত হন। তিনি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরিচিত হন এবং একই জমিতে কিভাবে চক্রাকারে ফসল ফলানো যায় সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।

জমি বন্ধক নেওয়ার পর তিনি সিদীপ থেকে প্রাপ্ত এস.এম.এপি-র ঋণ ১০,০০০ টাকা ও অন্যান্য খাতের ঋণ ৫০,০০০ টাকা এবং সবজি বিক্রয়ের লাভের টাকা দিয়ে মোট ৩ বিঘা জমিতে সবজি চাষ করেন। তার এই সবজি ক্ষেত থেকে এখন প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৫,০০০ টাকার সবজি বিক্রয় করতে পারেন। প্রতি সপ্তাহে তার খরচ হয় প্রায় ১,৫০০ টাকা এবং লাভ হয় প্রায় ৩,৫০০ টাকা। সে আশা করছে সবজি বিক্রয়ের টাকা দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করার পরও মূলধন হিসাবে বন্ধক নেয়া জমি এবং কিছু নগদ টাকা থেকে যাবে।

লাবণ্য আক্তার আরও জানান যে, সবজি ক্ষেতের কোন সমস্যা হলে ইউনিয়ন কৃষি কর্মকর্তা ও সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে তিনি যোগাযোগ করেন। সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা পশু ও কৃষি কল সেন্টার নাম্বারের ব্যবহার, বিভিন্ন পশু ও কৃষি সমস্যা সমাধান সম্বলিত মোবাইল এ্যাপসের ব্যবহার ও উপকারিতা নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করেছেন।

আবার, লাবণ্য আক্তার তার আগের টিনের বেড়ার ঘর ভেঙ্গে ইটের বাড়ি তৈরী করবেন। স্বামী সন্তান নিয়ে এখন তিনি সুখের সংসার করছেন। বর্তমানে তার দারিদ্র্য ঘুচে গেছে। বড় ছেলেকে বিদেশ পাঠাবেন এবং ছোট মেয়েকে লেখা পড়ার জন্য স্কুলে ভালোভাবে পাঠানো শুরু করেছেন।

লাবণ্য আক্তার জানান যে, পরিশ্রম করলে সাফল্য আসবেই। তবে তার জন্য সঠিক পরিকল্পনা তৈরী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ দরকার। সাফল্য অর্জন করতে কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প কোন কিছু নেই, লাবণ্য আক্তার তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

লেখক: ফিল্ড অফিসার (এগ্রি), মাইজদী ব্রাঞ্চ, সিদীপ

বই-আলোচনা

মাতৃভাষা ও শিক্ষা: শতবর্ষের ভাবনা

মাহ্‌ফুজ সালাম

বাংলা ও বাঙালির হাজার বছরের ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতির রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস। তবে যুগে যুগে ভিনদেশি শাসক এবং শোষকদের আধিপত্যের কারণে বাংলাভাষা বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের আগে কখনো রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা পায়নি। ভারতবর্ষে সুলতানী ও মুঘল আমলে রাজকার্য পরিচালিত হতো ফার্সি ভাষায়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকদের আমলে স্বদেশের উপর চেপে বসেছিলো ইংরেজি ভাষার আধিপত্য। এতেও গত হয়েছে প্রায় দুই শত বছর। এরপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাভাষার ওপর উর্দুভাষা চাপিয়ে দেবার যে ষড়যন্ত্র করেছিল, বাংলাদেশের জনগণ তা রুখে দিয়েছে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে। ১৯৫২ সালে বাঙালি জাতি মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার দাবীতে রক্তক্ষয়ী যে ইতিহাস গড়েছিলো তা পৃথিবীতে বিরল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে দেশ স্বাধীন হবার পর দীর্ঘ ৫৩ বছরেও রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা রাষ্ট্রের সর্বস্তরে কিংবা দেশের বিচার বিভাগ ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও বাংলার শতভাগ প্রচলন ঘটাতে পারিনি। উচ্চ শিক্ষাসহ বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও আমরা ভীষণভাবে ইংরেজি ভাষার উপর নির্ভরশীল। বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। এখনও কোর্টকাচারি, অফিস-আদালত ও বাইরের দেশের সাথে যোগাযোগ সব কিছুতেই ইংরেজি ভাষা ব্যবহার না করলে যেন আমরা জাতে উঠতে পারি না। বাংলা এখনও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

এই প্রেক্ষাপটে ২০২৪এর শেষ দিকে আলমগীর খানের সম্পাদনায় সিদীপ ও প্রকৃতির যৌথ প্রকাশনা 'মাতৃভাষা ও শিক্ষা: শতবর্ষের ভাবনা' গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি এক প্রবন্ধ সংকলন যাতে আটটি মূল্যবান লেখা স্থান পেয়েছে। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে ভাষাশহীদ থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ এবং দেশের জন্য সাম্প্রতিক ২০২৪ পর্যন্ত যারা জীবন দিয়েছেন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন তাদেরকে। যাদের লেখা এ গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে তাঁরা অনেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মনীষী, কেউ কেউ নবীন। অধিকাংশ লেখা অনেক পুরনো। একটি বিশেষ সময়ে লেখা হলেও তা কালের চৌকাঠ পেরিয়ে সমকালের প্রসঙ্গ ও ভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছে। এইসব লেখায় ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ভাষা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব দুর্দিন এসেছে তার প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরা হয়েছে। যা আগামী দিনে ভাষা ও শিক্ষার মান উন্নয়নে জাতির করণীয় স্পষ্ট করেছে। এসব আলোচনা বর্তমান পাঠকের মনে গভীর চিন্তার খোরাক যোগাবে।

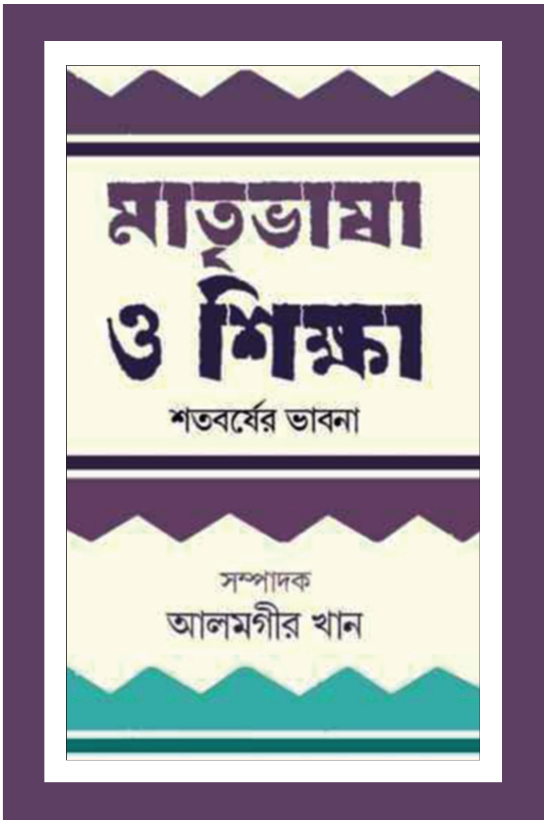

এই গ্রন্থে যেসব প্রবন্ধ সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলো হলো: অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা 'বঙ্গদেশে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিক্ষার বাহন' সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্টভাষা' (অংশবিশেষ), কাজী মোতাহার হোসেনের লেখা 'শিক্ষা প্রসঙ্গে', আলী আশরাফের লেখা 'সকল ভাষার সমান মর্যাদা' (১৯৫৩ সালে কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনে প্রথম প্রকাশিত), শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলামের লেখা 'ব্রিটিশের শিক্ষানীতি: রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ' (২০২২এ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত 'নতুন দিগন্ত' সাময়িকীতে প্রথম প্রকাশিত), কুদরতে খোদার লেখা 'ভাষার নীতি-দুর্নীতি-রাজনীতি ও বাঙালির উন্নয়ন' (২০২১এ ছোটকাগজ 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি'তে প্রথম প্রকাশিত), এবং শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খানের লেখা 'শিক্ষায় বধ্যতামূলক ইংরেজি ভাষা: জাতীয় বিকাশের অন্তরায়' (২০২৩এ আনু মুহাম্মদ সম্পাদিত 'সর্বজনকথা'য় প্রকাশিত)। বইটির চমৎকার প্রচ্ছদ এঁকেছেন আল নোমান। প্রবন্ধসমূহ বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে একীভূত করায়

পাঠক বইটি হাতে নিয়ে একাধিক লেখকের প্রবন্ধ এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করতে পারবেন। জাতীয় সত্তা বিনির্মাণে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এসব লেখা বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে পর্যায়ক্রমে।

ভাষা ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বৈষম্য মফস্বল থেকে শহর ও শহর থেকে মেগাসিটি পর্যন্ত বিস্তৃত। পাকিস্তান আমলে বিত্তবানদের উঁচুতলায় উঠার সিঁড়ি ছিল উর্দুর পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার প্রতি প্রীতি। বর্তমানে বিত্তবান এবং মধ্যবিত্তের দৃষ্টিতে বাংলা ভাষায় লেখাপড়া বেকার সৃষ্টি করে, এ মাধ্যমে লেখাপড়া শিখে ছেলেমেয়েরা বেশিদূর যেতে পারে না। তাই প্রয়োজন তথাকথিত 'আন্তর্জাতিক' ভাষা ইংরেজির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। কারণ ছেলেমেয়েরা এ ভাষায় পারদর্শী হলে স্বদেশে এবং বিদেশে সবখানেই বিত্তবৈভবের অধিকারী হওয়া যাবে সহজে। অগণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তৈরি হয়েছে সে ভাবেই। আমরা ছুটছি ইংরেজির পিছে। কিন্তু বাংলার মনীষীগণ বলছেন, বিদেশি ভাষা শিখার আগে প্রয়োজন নিজের মায়ের ভাষা ভালো করে শিখা। আমরা কি বাংলাটাই ঠিকমতো উচ্চারণ করতে, বলতে ও লিখতে পারছি? সর্বত্র দেখি বাংলার বিকৃতি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে হাটে-বাজারে, অফিস-আদালতে, ব্যানারে, সাইনবোর্ডে সর্বত্রই ভুলের মহোৎসব। শিক্ষিত নামধারী ছেলেমেয়েদেরও বলতে শুনি ইংরেজি-বাংলায় মিশানো এক খিচুড়িমার্কা ভাষা। যাতে শুদ্ধ বাংলাও নাই, সঠিক ইংরেজিও নাই।

বাংলাকে সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যার জন্য রক্ত দিয়েছিলো এ দেশের সূর্যসন্তানরা– এই হোক সবার প্রতিজ্ঞা। আমরা আর কতোকাল তাদের রক্তের সঙ্গে প্রতারণা করবো? 'মাতৃভাষা ও শিক্ষা: শতবর্ষের ভাবনা' বইটির বহুল প্রচার কামনা ও পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার আশা ব্যক্ত করছি। ভাষাভিত্তিক আমাদের জাতীয় সত্তা নির্মাণে ও জাতীয় সার্বজনীন মুক্তি অর্জনে এ প্রবন্ধ-সংকলনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি।

'সম্পাদকের কথা'র শেষাংশ দিয়ে আলোচনাটি শেষ করছি: 'বিদেশি ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। তবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় তা ঐচ্ছিক হওয়া প্রয়োজন, মোটেই বাধ্যতামূলক নয়। কারণ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। এখানে যার যা মাতৃভাষা তাতে প্রত্যেকের পূর্ণ অধিকার। অন্য ভাষা জানা অবশ্যই যারপরনাই ভাল, কিন্তু কেউ যেন তা জানতে বাধ্য না হন। এ বইটি এই প্রশ্ন মীমাংসায় সহায়ক হোক– এই কামনা।'

লেখক: উন্নয়ন কর্মী

শোকবার্তা

লেখক ও শিক্ষালোকের
নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খানের
মমতাময়ী মা সাহেরা খাতুন
গত ২রা জানুয়ারি ভোর রাতে
ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে
চিকিৎসাধীন অবস্থায়
মৃত্যুবরণ করেছেন।
(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
তাঁর মৃত্যুতে সিদীপ পরিবার
গভীরভাবে শোকাহত।

স্টলের সামনে সিদীপের নির্বাহী পরিচালকের সঙ্গে অন্যান্য কর্মীবৃন্দ ও কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সমৃদ্ধি ও কৈশোর কর্মসূচির অনুষ্ঠানমালা

বক্তব্য রাখছেন জনাব মো. মশিয়ার রহমান

বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ড. মো. তৌফিকুল ইসলাম, মো. মশিয়ার রহমান (ডানে), শাহজাহান ভুঁইয়া ও দীপেন কুমার সাহা (বামে)

অতিথি ও দর্শকবৃন্দ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য অধ্যাপক ড. মো. তৌফিকুল ইসলাম, পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. মশিয়ার রহমান ও উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব দীপেন কুমার সাহা গত ২৩-২৪ নভেম্বর ২০২৪ এ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায় সিদীপ কর্তৃক বাস্তবায়িত শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি, সমৃদ্ধি কর্মসূচি এবং কৈশোর কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শনে আরও ছিলেন সিদীপের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া, নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদাসহ সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। পরিদর্শনকালীন তাঁরা ২৩ নভেম্বরে এনজিও প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের সাথে পৃথক পৃথক সভা করেন। ২৪ নভেম্বরে কসবা উপজেলার চারগাছ এন আই ভূঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত 'প্রীতি ফুটবল ম্যাচ- ২০২৪' ও 'দাবা প্রতিযোগিতা-২০২৪'-এর উদ্বোধন করে মাঠে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন। এছাড়াও স্কুল মাঠে সিদীপ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন স্টল (যেমন: পিঠা মেলার স্টল, কৈশোর কর্মসূচির স্টল, প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রের স্টল, স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির স্টল, সিদীপ এন্টারপ্রাইজ স্টল) পরিদর্শন শেষে চারগাছ এন আই ভূঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' পরিদর্শন করে স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন। এরপর 'ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী' অনুষ্ঠানে সিদীপ শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক) ও কৈশোর কর্মসূচির শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন এবং সবশেষে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে
ভূমিহীন মনুমিয়া গাইবে তৃপ্তির গান জ্যৈষ্ঠে-বোশেখে,
বাঁচবে যুদ্ধের শিশু সসম্মানে সাদা দুধে-ভাতে ॥

শিক্ষালোক
কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

Shikkhalok
(a CDIP education bulletin)
11th year 4th issue, October 2024-January 2025